নীলকর বিদ্রোহ

ডাঃ সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী

অধ্যয়ন
২০/এ, গোবিন্দ সেন লেন
কলকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
অধ্যয়ন :
২০/এ গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা-১২
ফোন ৩৪-৬১৩৫

মুদ্রক :
সুশীল প্রিণ্টার্স
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
২, ঈশ্বরমিল বাই লেন
কলকাতা-৬

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

ভূমিকা

'নীলকর বিদ্রোহ' কথাটা শুনলেই আমাদের মানস চোখের সামনে সেই ঊনবিংশ শতকের চেহারাটা ফুটে ওঠে, যখন সাহেব কুঠিয়ালরা বঙ্গদেশে গরীব চাষী ও গ্রামবাসীর ওপর এক অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সুতরাং 'নীলকর বিদ্রোহ' নামের পুস্তক স্বভাবতঃই গত যুগের কাহিনী বলে পাঠকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, গত শতাব্দীর স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্র রচিত অবিস্মরণীয় 'নীলদর্পণ' নাটকে বর্ণিত নীল বিদ্রোহ-ই একমাত্র নীলকর আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন ও অত্যাচার সেই নাটক লেখার পরেই উৎখাত হয়ে গেছে, এমন ধারণা সর্বত্র। কিন্তু আলোচ্য 'নীলকর বিদ্রোহ' বইটি পড়লে জানা যায় যে, বিগত শতকের নীলকর অত্যাচার ও নীলের চাষ তার ব্যাপকতা হারিয়ে ফেলেছিল বটে, কিন্তু এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও তা বজায় ছিল। বঙ্গদেশের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে ব্যাপকভাবে নীলের ও বিলিতী যবের চাষ বা ব্যবসায় বজায় ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মেসার্স মিডনাপুর জমিদারী কোং লিমিটেডের হিসেব নিকেশের মধ্যেই এর দলিলগত প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে নীলের ও বিলিতী যবের ব্যবসায়ের দ্বারা কি পরিমাণ মুনাফা তখনও অর্জিত হতো। এর কারণ এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার পর জার্মানী থেকে নীলের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল এবং তার দাম চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তখন ১৯১৪ সালের পর উত্তরবঙ্গে নীল ও বিলেতী যবের চাষ প্রচুর পরিমাণে নতুন করে প্রবর্তন হলো। সেই সঙ্গে আবার সুরু হলো ব্যাপক অত্যাচার, অনাচার ও শোষণ। রাজসাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও পাবনা জেলার কৃষি-মজুরগণ জীবনপণ করে যে আন্দোলন এর বিরুদ্ধে সুরু করেছিল, তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। কারণ, সেদিনের (১৯১৭-১৯২০) জাতীয় কংগ্রেস কৃষকদের এই 'নীলকর বিদ্রোহের' প্রতি কোন সহানুভূতি ও সমর্থন জানালো না। কংগ্রেসের এই চরিত্র ইতিহাসের দিক থেকে নিশ্চয়ই মনে রাখার মত।

আমরাও উত্তরবঙ্গে নীল ও বিলিতী যব চাষের এই অত্যাচার কাহিনী জানতে পারতুম না যদি না স্বর্গতঃ ডাক্তার সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যেতেন। যৌবনকালেই মেডিকেল ছাত্ররূপে সোমেশ্বর প্রসাদ

জাতীয় আন্দোলন ও সমাজসেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিনি স্নেহধন্য হয়েছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও শোষিত চাষীদের জন্য তিনি অনেকদিন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁদের দুর্গতি নিবারণ ও 'দেশী' নীলকর সাহেবদের অনাচার প্রতিরোধ করার জন্য। আত্মজীবনীর আকারে লিখিত এই পুস্তকে উত্তরবঙ্গের দরিদ্র চাষীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও লড়াইয়ের কাহিনী যেমন জানা যাবে, তেমনি সেই আন্দোলনের নেতা ডাক্তার সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী কি ভাবে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সমস্ত নাটকীয় ঘটনাও বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠবে। জমিদার, ইংরেজ শাসক, পুলিশ কর্মচারী এবং আমাদের স্বদেশবাসী অর্থাৎ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের এবং সমাজের একটা চিত্রও এই পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যাবে। গল্পের আকারে লেখা, সুতরাং পাঠকেরা একসঙ্গে ইতিহাস ও কাহিনীর স্বাদ পাবেন। এই বইয়ের জন্য পরলোকগত ডাক্তার সোমেশ্বর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

২২।২।৭২

নিবেদন

'নীলকর বিদ্রোহ' বইটি আমার স্বামীর বহুপূর্বের দিনলিপি থেকে উদ্ধার করা। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর সাংসারিক নানা অসুবিধা ও অর্থাভাবের জন্য এতদিন পর্যন্ত বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

আমার বন্ধু-বান্ধব ও পুত্র-কন্যাদের আগ্রহে বইটি প্রকাশের ইচ্ছা করি। কল্যাণীয় শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ বাবাজীবনের আন্তরিকতা ও সহযোগীতায় বইটি আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ লাভ করল, সেজন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই দীর্ঘদিন বই প্রকাশ না করতে পারায় আমি আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি, পাঠকমহোদয় ও পাঠিকামহোদয়েরা আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ—আমার এই দীর্ঘসূত্রতার ত্রুটি মার্জনা করে, আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখবেন। নমস্কার ইতি বিনীতা নিবেদিকা—

পি ৮৮ বি কে পাল এভিনিউ
কলকাতা-৫

মৃণালিনী চৌধুরী



নীলকর বিদ্রোহ

{অ}সহযোগ আন্দোলনের যুগ। আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ইচ্ছা বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলেই ইউরোপে পাড়ি জমাবো উচ্চতর ডিগ্রী লাভের নবই ঠিক, কিন্তু বিধাতাপুরুষই বাম। হেদুয়ায় সেদিন দেশবন্ধু সি আর মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটা মিটিং ছিল, সব ছাত্রের সঙ্গে আমিও ন উপস্থিত হয়েছি। (দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের কোন মিটিং তো দূরের চোখেও তাঁকে কখনও দেখিনি সে পর্যন্ত)।

ই গর্বোন্নত সুদীর্ঘ সৌম্য মূর্তি এবং প্রাণকাড়া-আহ্বান আমাকে যেন আকর্ষণে তাঁর সমীপে টেনে নিয়ে এলো। সমস্ত সভাস্থলের উপস্থিত নির্বাক নিঃশব্দে তাঁর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল। এক সময়ে তিনি সকলকে ন করে বললেন, 'আমি যে এতক্ষণ ধরে তোমাদের কাছে আমার কথাগুলি গলাম, কই কেউ তো কিছু বললে না? আজও কি তোমরা স্কুল-কলেজ বেরিয়ে আসতে চাও না? দেশের কাজ যে সকলের, কারুর একার দ্বারা য়।'

মি নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন তার বক্তৃতামঞ্চের উপরে উঠে প্রাণের কি বলেছি জানি না, দাশ মহাশয়ের সস্নেহ আলিঙ্গনে আমার লুপ্ত ফিরে এলো। আমিও কিন্তু বক্তৃতামঞ্চে উঠবার আগে পর্যন্ত সমস্ত সঙ্গেই ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দাবী জানিয়েছি।

য়িক হলেও প্রত্যেক কলেজের ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে এসেছিল। কলেজ ছেড়ে আমিও ১৭ নং ভীম ঘোষ লেনে শ্বশুরবাড়ি এসে আশ্রয়

নিলাম এবং শ্বশুর মহাশয়কে জানালাম আমি ঐ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে আর পড়বো না, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবো।'

১৬ বছর বয়সেই আমার মা আমার বিবাহ দেন। শ্বশুর মহাশয়, শ্বশ্রূমাতা এবং স্ত্রী সকলেই আমায় বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমাকে তখন বোঝানো বৃথা!

অবশেষে ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হাজির হলাম। বড় বাড়ি, উপরে ও নীচে অনেক ঘর, অনেক ডিপার্টমেণ্ট। বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ডিপার্টমেণ্টে যোগ দিলাম। সাদা কথায় কেরানীর কাজ করতে হতো, দৈনিক সকালে ভীম ঘোষ লেন থেকে এসে কাজে যোগ দিতাম ও ১২টায় আহারের জন্য পুনরায় ভীম ঘোষ লেনে এসে একটায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যেতাম এবং রাত্রে ফিরতাম। এই ছিল প্রথম প্রথম কার্য তালিকা।

পনের-বিশ দিন কাটলো আশার মধ্য দিয়ে। পরে বুঝলাম যে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের আশা এখন অনেক দূরে। যা হক, তখন আমি ভলেন্টিয়ার ডিপার্টমেণ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করলাম। ভলেন্টিয়ারদের আমি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তাঁদের সঙ্গে মেশবার সাহসও হতো না, ভাবতাম, 'এরা দেশমাতৃকার সৈনিক, এরা আত্মাহুতি দিয়েও দেশের সেবা করতে প্রস্তুত। আমার মাথা যেন আপনিই তাঁদের পদতলে নত হয়ে পড়তো। যাঁরা প্রয়োজনবোধে আজ এখনি কামানের মুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত, তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা বা খারাপ কিছু ধারণা করাও আমার কল্পনার অতীত! নীরবে তাঁদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে যেতাম এবং দূরে দূরেই থাকতাম।

ত্রিতলের একটি ঘরে ভলেন্টিয়ার ডিপার্টমেণ্ট, কর্মকর্তা বয়স্ক কয়েক ব্যক্তি থাকতেন, সে ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকতো, আমি নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সেখানে কখনো যাই নি—কারণ তাঁরা বয়োবৃদ্ধ এবং তাঁদের দু-পাঁচ জন ছাড়া অধিকাংশকেই আমি পছন্দ করতে পারি নি। যখনই তাঁদের ঐ ঘরে গিয়েছি, দেখেছি—চা, চপ, ডিম ইত্যাদি অবাধে সেখানে চলছে। প্রয়োজন হলে যাঁদের এখনই জেলখানায় ঢুকতে হবে তাঁদের এতটা খাওয়ার নেশা বা বাবুগিরি করাটা আমার ভালোও ঠেকতো না, তাঁরাও বোধ হয় এটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমি তাঁদের ঘরে ঢুকলেই তাঁরা যেন অস্বস্তিবোধ করতেন। প্রতি ঘর ঘুরে

এবং লোকগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে বুঝলাম এঁরা সকলেই কর্মবিমুখ ও আয়েসী। এদের উদ্দেশ্য শুধু কংগ্রেসের পয়সায় কলকাতা বেড়ানো ও থাকা খাওয়া।

রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ও খবরের কাগজ বিক্রির পয়সায় যা আয় হোতো অনেকেই তা 'দেলখোষ কেবিনে' মুর্গি মাট্‌নে ঢেলে আসতেন। তাঁদের অনেকের উপর যে ধারণা আমার তৎকালে হয়েছিল, ভবিষ্যতে তাঁরা সেইরকম স্বার্থান্বেষী বলেই প্রমাণিত হয়েছেন।

গঙ্গার স্রোতে ময়লা ও নির্মাল্য যেমন পাশাপাশি ভেসে চলে, দেশমাতৃকার এই বিরাট যজ্ঞে তেমনি চোর ও সাধু একত্রে চলার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। গঙ্গা যেমন ময়লা বুকে নিয়েও অপবিত্র হন না, এই কংগ্রেস আন্দোলনও তেমনি তাঁদের নিয়ে হতগৌরব হয় নি।

মনে মনে ভাবতাম, 'ঠক বাছতে গাঁ উজাড' হয়ে যাবে, যদি কিছু সংস্কার এর মধ্যে করা যায় দেখি! এই ভেবে একদিন আমি অর্গানাইজেসন ডিপার্টমেণ্ট গিয়ে হাজির হলাম। মাননীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পরে অভিনেতা হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন) সদালাপী মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। ভলেন্টিয়ারদের কর্মহীনতা ও আলস্যে সময় কাটানোর কথা তাঁকে জানালাম, তিনি তদন্ত করে সমস্ত ব্যাপারটাই সত্য বলে জেনেছিলেন, তার পর হতে তিনি আমায় ছোট ভাইয়ের মত স্নেহের চক্ষেই দেখতেন।

আমি তাঁকে একটি স্কুলের মত পিতলের পেটা ঘণ্টা চাইলাম, ভোরে ওঠার জন্য সকলকে পাঁচটার সময় জাগিয়ে দেবার সুবিধে হবে। মনোরঞ্জনবাবু আমার কথামত 'লেকচাররুমে' ও প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমাকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, সবাই যেন আমার কথা শোনে। তখন থেকেই ঐ বাড়িতে আমার থাকা ও থাওয়ার ব্যবস্থা হলো। পাঁচ-ছয় দিন পর পর গিয়ে ১৭নং ভীম ঘোষ লেনের বাড়িতে দেখা দিতাম। আমার কাজের প্রতিবাদ বাড়িতে শুনতে হতো প্রথমপ্রথম, পরে আর কেউ কিছু বলতেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, কিছু বলা বৃথা।

যা হক, আমার এই নূতন চাকরিতে ভলেন্টিয়ারদের অনেকটা কর্মঠ হতে হোলো। শয্যাত্যাগের পর ছাতে ড্রিল করানো হতো। ভোর পৌনে পাঁচটায় ঘণ্টা পিটিয়ে যখন উপর নীচের সকলকে ঘুম ভাঙ্গাতাম, তখন সকলে যে

আশীর্বাদ করতেন না সেটা বলাই বাহুল্য। অনেকের সুমধুর সম্ভাষণ আমার কানে এসে পৌঁছুতো, কিন্তু আমি না শোনার ভান করে সরে যেতাম। দিনকয়েক এইভাবে চলার পর আমার বিরুদ্ধে একটি দলও গড়ে উঠলো, বিশেষ যাঁরা একটু মোড়লগোছের ছিলেন, তাঁরাই যেন বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বিদ্বেষবহ্নি ভিতরে ভিতরে 'ধূমায়িত' হতে লাগলো।

এর মধ্যেই একটি দল কিন্তু আমার স্বপক্ষে এসে গেল এবং আমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করলো। আমার বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র চলছিল বিরুদ্ধ দলের, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মধ্যে গোপনে, সেটাও আমার জানতে বাকি থাকতো না।

রাস্তায় ভিক্ষালব্ধ অর্থ যাতে বাজে খরচ না হয়ে যথাযথভাবে অফিসে জমা 'পড়ে সেজন্য সকলকেই অনুরোধ করতাম। দেশের কাজের জন্য দশজনের দানের পয়সা অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়, এও জানাতাম ভগবান তা হলে রুষ্ট হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্মকর্তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশও হচ্ছিল, কিন্তু কর্মকর্তারা তখন আমার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট সেজন্য সে নালিশে কুফলের চাইতে সুফলই ফলেছিল। এই সময় একদল ভলেন্টিয়ার রাস্তায় তরুণমতি স্কুল-বালকদের মাঝে সন্ত্রাসবাদ প্রচার করতে সুরু করে। বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তারা এ কাজ হতে নিরস্ত হয় না দেখে আমি কর্তৃপক্ষের গোচরে জানাই।

এই সময় প্রচার বিভাগের এক ভদ্রলোক, বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পুলিশ বিভাগের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেন এবং এও বলেন যে দৈনিক একটি করে 'ভলেন্টিয়ারদের লিষ্ট আই, বি, ডিপার্টমেণ্টে যায়। আমি ভীত হয়ে পড়লাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার নামও কি তাহলে আই. বি.-রা নিয়ে গেছে ?' আমার নামও গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তিনি এ কথাটাও বেশ ভালভাবে আমায় জানিয়ে দিলেন।

এই সময় আমার বিরুদ্ধপক্ষদের মধ্যে একটা শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা হচ্ছিল এবং প্রকাশ্যেই আমার আদেশ অমান্য হলো আর ঐ ভিক্ষালব্ধ অর্থ দিয়েই চপ, কাটলেট খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়লো তিনজন। তাদের নীচের একটি ঘরে রাখা হলো। রোগীদের শুশ্রূষার ভার আমার ওপরেই পড়লো। তিনদিন তিন রাত্রি আমি সেই কলেরা রোগী নিয়ে থাকলাম ; ডাঃ কুমদশঙ্কর রায় মহাশয় ঐ রোগীর চিকিৎসা করছিলেন, তিনি মেডিকেল ছাত্র হিসাবেই আমার ওপর

রোগীর শুশ্রূষার ভার দিয়েছিলেন। এই সময় অনেকেই সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যায়, ঠিক যে কলেরার ভয়েই গিয়েছিল তাও নয়, কি কারণে যে কার্য ত্যাগ করে চলে যায় তা আমি জানতাম না।

যা হক, এই সময়ে রান্নার লোকও চলে যায়। কাজেই কলেরা রোগী একটু সুস্থ হতেই তার দেখাশোনার ডিউটি দেওয়া হল। ভলেন্টিয়ারদের লিষ্ট হাতে পেয়ে যার উপর খুসি ব্যাজ বেঁধে ডিউটি দেওয়ারও হুকুম দেবার আদেশ কর্তৃপক্ষের কাছ হতে পেলাম। আমাকে ভলেন্টিয়াররা ভীতির চক্ষে দেখতে লাগলো, ডিউটি লিষ্ট তৈরি করে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হতো।

সঙ্ঘের মধ্যে পাঁচ-ছয় জনকে দেখতাম ত্যাগ ও কর্মের অবতার। তাঁদের কর্মকুশলতায় আমাকে তাঁরা মুগ্ধ করেছিলেন।

ষড়যন্ত্র বা দলাদলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল, আমার আদেশ পালনে সকলেই তৎপর হয়ে উঠতে লাগলেন। কেহ উপস্থিত না থাকলে তাঁর কাজও আমি করে দিতাম। এই সময় প্রত্যেক ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলাপের সুযোগ এলো। শ্রীমান প্রসন্নকুমার ঘোষ নামে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো, সে সব সময় আমার সঙ্গে থাকতো এবং আমাকে ভালবাসতো।

রোগী তিনজন সেরে ওঠায় ওদের অভিভাবকরা এসে তাদের নিয়ে গেল। তারপর গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য ভলেন্টিয়ার পাঠানো হতে লাগলো। রান্নার ডিউটি দিয়ে আমারও কদিন কাটলো, কিন্তু এই উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। মন যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল। এদিকে প্রসন্নকুমার আমাকে একটা অত্যাচারিত উৎপীড়িত অঞ্চলের কথা প্রতিনিয়ত শোনাতে লাগলো। কে একজন ঘনশ্যাম আগরওয়ালা নামক ব্যক্তির চিঠি পড়ে শোনালো। তাঁর চিঠিতে তিনি একজন ভাল বক্তা নিয়ে যাবার জন্য লিখেছেন। দু-তিন দিন অন্তরই এক-একটি চিঠি আসতে লাগলো এবং প্রসন্নকুমার আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলো। আমার অন্তরের মাঝেও যেন কে বলে উঠলো, 'একবার গিয়ে দেখ না কেন।' প্রসন্নকে বললাম, 'ভাই অনেক বড় বড় বক্তা তো সঙ্ঘের মধ্যে রয়েছেন, তুমি তাঁদের কাউকে নিয়ে যাও না কেন, আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে?'

প্রসন্ন কি বুঝেছিল জানি না। সে জোরের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'আর কাউকে চাই না, আপনাকেই যেতে হবে।'

কংগ্রেসের প্রচার বিভাগে কাজ করবার ইচ্ছা মনের মধ্যে মোটেই ছিল না, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের আশা এখনও মন থেকে বিলীন হয় নি। ডাক্তারী পাশ করতেই হবে, কারমাইকেল মেডিকেলে পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আমার আজও রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে বেকার, প্রতিনিয়ত প্রসন্নকুমারের অনুরোধ এক অজানা আহ্বানে আমাকে যেন উতলা করে তুললো।

এই দোদুল্যমান দোটানার মধ্যে মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না, আমিও পারি নি। স্থির করলাম, এ বিষয়ে মাননীয় দাশ মশাইয়ের সঙ্গে যুক্তি করে তথ্য সংগ্রহের পর কাজে নামাই ভালো। প্রসন্নর কথা যদি আংশিকভাবেও সত্য হয়, তাহলে কর্তব্য স্থির করাও সহজ হবে। পরদিন সকালেই মাননীয় দাশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রসন্নকুমারও আমার সঙ্গে গেল। বেলা এগারোটার সময়ে সাক্ষাৎ মিললো। তখন সেখানে সেই মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ ছিলেন না। তাঁকে প্রণাম করে সোজাভাবে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর সে দৃষ্টি দেখে মনে হলো, তিনি বোধহয় আমার মর্মস্থল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করছেন। গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আমার কাছে কি প্রয়োজন?' বিনীতভাবে জানালাম 'মেদিনীপুর জমিদারী কোং নাম কি আপনি শুনেছেন?'

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'হাঁ শুনেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে দু-একটি মামলাও করেছি, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারি নি।'

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ জমিদার কোং অধীন প্রজাদের উপর যে এখনও অযথা অত্যাচার হয় জানেন?'

উত্তর দিলেন, 'সব জানি এবং অত্যাচার নিবারণের জন্য আইনত দু-একটা চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কিছু ফল হয়নি।'

পুনরায় বললাম, 'এ অত্যাচারের কাহিনী সবই কি সত্য?'

উত্তর দিলেন, 'সবই সত্য, প্রতিকার করার ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে তবে সেটা বৃথা! এর আগে দেশের দু-একজন গণ্যমান্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিও অকৃতকার্য হয়েছেন। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট থাকতে ঐ সাহেব কোং-এর অত্যাচার নিবারণ করা একরকম অসম্ভব। বর্তমানে ঐ কাজে হাত দিলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে একটা বড় বিশ্রী আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই, সাহেবদের অত্যাচার নিবারণ করতে গিয়ে যদি দেশীয় জমিদারের কিছু ক্ষতি হয়

তাতেও আমি তোমার সঙ্গে আছি, তবে কংগ্রেস তোমার সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু তুমি নিতান্ত অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ, তোমার দ্বারা কি হতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।'

মহাপুরুষের শেষের কথা ক'টিই আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন এক অপূর্ব প্রেরণা জাগিয়ে তুললো।

আমার দেহের মধ্যে যেন রক্তের স্রোত প্রবলভাবে বইতে লাগলো, হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগলো, আমার পৌরুষ যেন সদ্য জাগ্রত হয়ে উঠলো, প্রাণের মধ্যে অসহনীয় বেদনাও অনুভব করলাম। আমি শান্ত দৃঢ়কণ্ঠেই নিবেদন করলাম, 'আমি যাবো।'

প্রশ্ন হলো, 'কোথায় যাবে?'

বললাম, 'রাজাসাহীর ঐ অঞ্চলে, যেখান থেকে ডাক আসছে।'

প্রশ্ন হলো, 'কেন যাবে?'

উত্তর দিলাম, 'দেখতে যাবো।'

তিনি বললেন, 'কি লাভ হবে?'

এবার একটু জোরের সঙ্গেই বললাম, 'তবুও দেখতে যেতে চাই।'

শ্রদ্ধেয় নেতা নীরবে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। সমস্ত ঘরখানির মধ্যে শুধু চলমান বৈদ্যুতিক পাখার আওয়াজ ও নিজের হৃৎস্পন্দন ভিন্ন কিছুই যেন শোনার ছিল না। একদৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘায়ত আঁখিপল্লবের দিকে লক্ষ্য করে মনে হল, সে দৃষ্টি যেন আমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলছে। সে মর্মস্পর্শী দৃষ্টির যে কি তীব্র তীক্ষ্ণতা, তা বোঝানো যাবে না।

নীরবে ক্ষণকাল চিন্তার পর বললেন, 'বেশ তুমি প্রচার বিভাগে নাম লিখিয়ে খরচ নিয়ে রওনা হও।'

শান্তভাবে বললাম, 'নাম লিখিয়ে কোথাও যাবো না।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'পুলিশকে আমার বড় ভয়। কোন কিছু করবার ক্ষমতা হবে কি না তার কিছু ঠিক নেই, অথচ মিছামিছি আমার নাড়ী নক্ষত্র সব খবর পুলিসে যায় তা চাই না।'

তিনি বললেন, 'সে ভয়ানক স্থান, এত ভয় নিয়েও সেখানে যেতে চাও? তোমার জীবন পর্যন্ত যেতে পারে, তবুও যেতে চাও?'

উত্তর দিলাম, 'প্রাণের ভয় করি না, পুলিশের লাঞ্ছনার ভয় করি।'

'কবে যেতে চাও?' তিনি জানতে চাইলেন।

'আজই যেতে চাই।'

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটায় ট্রেন জানো?' তিনি নিজেই টাইমটেবল দেখে জানালেন বিকেল সাড়ে চারটায় ট্রেন শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে। খরচের জন্য একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রাখো! পরে প্রয়োজন হলে জানাবে, পাঠাবো। আমিই তোমাকে পাঠাচ্ছি, কংগ্রেস নয়। তোমার অভাব অভিযোগ পত্রে আমাকেই জানাবে।

মহাপুরুষের পদধুলি মাথায় নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি এসে জানালাম, আমি পাবনা জেলার ধাপাড়ী গ্রামে যাচ্ছি, তবে শীঘ্রই ফিরবো। অনেক প্রকাশ্য ও মৌন আপত্তি হল, কিন্তু বৃথা! খদ্দর ছিল না, একটি গরদের চাদর ও একটি এলুমিনিয়মের ঘটি (সামনে যা পেলাম তাই নিয়ে) আর একখানি কাপড় সম্বল করে পথে যাত্রা করলাম। সাড়ে চারটায় দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম, সঙ্গে প্রসন্নকুমার, ট্রেন ছেড়ে দিল। সব সময়েই ট্রেনের চলতি আওয়াজের মাঝে শুধু—'তুমি তো অনভিজ্ঞ বালক, তোমার দ্বারা কি হতে পারে?' এই কথাগুলি কানে ঝংকৃত হতে লাগলো। প্রসন্নকুমারের সঙ্গে দু-চারটি প্রশ্ন হচ্ছিল; অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করার পর বাইরের ঘনঘটাচ্ছন্ন কালো আকাশ ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মনটিও যেন দোল খেতে লাগলো। ঝড়ের বেগের সঙ্গে গাড়ির গতিবেগের সংঘর্ষ চলছিল, মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন সমস্ত ভেঙ্গেচুরে নতুন করে গড়ে তুলবে।

জল ঝড়ের মধ্যে রাত্রি সাড়ে আটটায় এসে ঈশ্বরদি ষ্টেসনে থামলো। পূর্বেই প্রসন্ন যে টেলিগ্রাফ করে রেখেছিল জানতাম না। ছাতা ও লণ্ঠন নিয়ে দুজন লোক ষ্টেসনে হাজির ছিল। ওভারব্রিজে ওঠার আগেই ছাতা পেলাম। লোক দুটি আগে আগে পথপ্রদর্শক হিসাবে চলতে লাগলো। এক হাঁটু জল-কাদা পার হয়ে বিলাসরাম আগরওয়ালার আড়তে এসে উঠলাম। শুনলাম, আড়তে যিনি ছিলেন তিনি ঘনশ্যাম আগরওয়ালার ছোট ভাই। সেই দুর্যোগের মধ্যেও তিনি আমাদের যেরকম আদরযত্ন করলেন তাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। ঘনশ্যামবাবু বিকালে ধাপাড়ী চলে গেছেন। আমরা পরদিন ধাপাড়ী এলাম ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি।

এই বাড়ির প্রাঙ্গণের অপর পাড়ে একটি নদী ও বটগাছের দিকে মুখ করে দুখানি বড় আড়তঘর, একখানি ঘনশ্যামবাবুর অন্যখানি রামকুমারবাবুর। আড়তঘরের পিছনেই ঠাকুরঘর ও তৎসংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান। ফুলবাগান আর ঠাকুরঘরের পিছনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আম ও নিম গাছ রয়েছে পাশাপাশি। রামকুমারবাবু ও ঘনশ্যামবাবুর আড়তের পিছনে তাঁদের নিজ নিজ অন্দরমহল। অন্দরমহলের ডাইনে গোলাবাড়ি আর বামে ফলের বাগান। আম, জাম, নারিকেল, পিচ, সফেটা প্রভৃতি সব গাছই তাতে আছে। বাগানটি বাঁশের বেড়া দিয়ে সুদৃঢ় করে ঘেরা। সকালবেলা গিয়ে বটবৃক্ষ তলে বসলাম। দামোশ নদীর অপর পাড়ে সুদূরপ্রসারী সবুজ ধানক্ষেতে বাতাসের খেলা চলছে, দামোদরের জলে সূর্যকিরণসম্পাতে রূপোলি ঝিলিক দিয়ে ঢেউ খেলছ। বাঁশ দিয়ে ঘেরাও (খেদান) করে জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। দূরে আসল পদ্মার কতকাংশ দেখা যাচ্ছে, গতরাত্রে বৃষ্টির হওয়ার জন্য হাওয়া তখনও ঠাণ্ডা ও সিক্ত মনে হচ্ছিল। ওই আবহাওয়ার জন্যই ঐ স্থানটি পবিত্র আশ্রমের মত মনে হতে লাগলো।

দুই

ক্রমে ক্রমে আমাদের এখানে আসার সংবাদ ধাপাড়ীতে প্রচার হয়ে গেল। স্থানীয় লোকজন ব্যাপারীরা এসে আমাদের দেখতে লাগলো। কেউ বা খুসী কেউ বা বিরক্ত হয়ে চলে গেল। ঘনশ্যামবাবুর দয়াবতী পত্নী আমাদের রুটি ও ভাজি খাওয়ালেন। বিকালে ঘনশ্যামবাবু এলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি নৌকোযোগে আমাদের নিয়ে ধাপাড়ী হতে গঙ্গাবাজারে নিয়ে গেলেন। ধাপাড়ী থেকে গঙ্গাবাজার দেড় মাইল দূরে দামোশের ধারেই অবস্থিত। ধাপাড়ী কিন্তু পাবনা জেলা এবং গঙ্গাবাজার রাজশাহী এলাকা, হয়তো ভবিষ্যতের দরকার বুঝেই শ্রীভগবান এই ত্রিবেণীসঙ্গমে স্থান দিলেন।

বাজার বিকেলেই বসে, ভীড়ও খুব হয়। ঘনশ্যামবাবু আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে মাজপাড়া গঙ্গাবাজারের নায়েব নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশায়ের ছেলে তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল, পিতা পুত্র উভয়েই সদালাপী। এই জমিদারী মেদিনীপুর জমিদারী কোং সাহেবদের, এই গঙ্গাবাজার থেকেই ওদের এলাকা আরম্ভ।

আমাকে ছেলেমানুষ দেখে এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে নায়েব মশায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং এই বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ায় (বিশেষ মেডিকেল কলেজ) তিনি দুঃখ প্রকাশও করলেন। বিশেষ যখন শুনলেন যে আমার স্বর্গীয় পিতাও ১৮৭৮ সালের এম. বি. ডাক্তার ছিলেন আর আমি বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র, তখন তিনি আমাকে অনেক বুঝাবার চেষ্টাও করলেন। আমি নীরব, তখন তিনি কি বুঝলেন জানি না, আমাকে বললেন 'সাহেবদের এ এলাকায় তোমাদের কংগ্রেস-টংগ্রেস কিছু চলবে না, মিটিং করাও চলবে না। এমনকি আমার মনিবদের মত না হলে, আমার কাজের কোন বিঘ্ন ঘটানোও চলবে না।'

মিটিং করতে না দিলেও কংগ্রেসের বাণী মুখেমুখে প্রচার করতে লাগলাম, দেখলাম গরু-মহিষের গাড়িবওয়া ও বাথান চালানো এবং তরিতরকারী বিক্রি করাই এখানকার চাষীদের প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেক বাগানে ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত গাই, গরু ও মহিষী আছে। বাজারে অপর্যাপ্ত দুধ ও তরিতরকারী আমদানী হয়ে থাকে। এখানকার হালদারেরা (জেলেরা) পদ্মা ও দামোশে ইলিশ মাছ ধরে বেশ দুপয়সা রোজগার করে। চাঁদিনী রাতে দামোশে পানসী চড়ে ধাপাড়ী ফিরলাম।

পরদিন প্রাতে দামোশ পার হয়ে গম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে 'বৈরাগীর চর' এসে হাজির হলাম। হোসেনী মোল্লা এই চরের প্রধান পরামাণিক। তার সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মুখে যেসব অত্যাচারের কাহিনী শুনলাম, তাতে বুঝলাম প্রসন্নকুমার যা জানিয়েছে তা বর্ণে বর্ণে সত্যি, অল্পক্ষণের মধ্যেই হোসেনী মোল্লার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতা জমে উঠলো, হোসেনীদাদাকে অনুরোধ করলাম, 'দাদা একটা বড় রকমের সভার যোগাড় করতে পারো?'

আমার কথায় হোসেনীদাদা হেসে উঠলেন, 'এ এলাকায় কি সভা-টভা করতে দিবে, আপনি যে সভা করবেন, সভা শেষ করে যদি পলায়ে যান তখন অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। আপনারা দুজনে মনটা স্থির করে নেন, তারপর আমাকে জানান। আপনারা দুজন যে এখানে আসছেন তার ফল কি হয় আগে দেখা যাক, তারপর সভার কথা।'

হোসেনীদার ওখানে দুধ খেয়ে আমরা ধাপাড়ীতেই ফিরলাম। কলকাতা থেকে আসার সময় প্রসন্ন আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, আমাকে ছেড়ে

কোথাও যাবে না আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাকে ফেলে পালাবো না। ধাপাড়ী ফেরার পথে পুনরায় তাকে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম।

ধাপাড়ী ফিরে দেখি, ঘনশ্যামদার মুখখানি গম্ভীর। তিনি জানালেন, বিলমারিয়া কুঠির ম্যানেজার Major Tailor সাহেব নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, 'কংগ্রেসী কোন লোককে যেন কোনরূপ সাহায্য না করা হয়, যে-কেহ সাহায্য করবে তার শাস্তিভোগ করতে হবে। কংগ্রেসী লোককে যেন বিধিমত জব্দ করা হয়।' ঘনশ্যামবাবুকেও ঐ আদেশ জানিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনিও কোনরূপ সাহায্য না করেন কংগ্রেসীদের। হুকুম পাওয়া মাত্র যেন কংগ্রেসী লোক তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সংবাদ শুনে ঘনশ্যামবাবুর বিপদ বুঝতে পারলাম। মনে চিন্তা বেড়েই চললো। আহার শেষ করে আমরা বটগাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় একটি লোক এসে প্রসন্নকুমারকে একটি পত্র দিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, প্রসন্নর জননী পত্রটি দিয়েছেন একবার দেখা করার জন্য। প্রসন্ন আপত্তি জানালো—'যাবো না'।

সন্ধ্যার একটু পরে আমি বললাম, 'চল না একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।' আমার যাবার কথা শুনে প্রসন্ন একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'আপনার গিয়ে কাজ নেই, আপনি শুনেছেন আমার বাবা বিলমারিয়া কুঠির বড় দেওয়ান হৃদয়নাথ ঘোষের নামে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায়। বাবা যদি আপনার ওপর কিছু অত্যাচার বা অপমান করেন, আমার যে তাহলে দুঃখের সীমা থাকবে না। আমার মনে হচ্ছে আপনার না যাওয়াই ভাল।'

আমি তাকে বুঝিয়ে বলয়াম, 'তোমার বাবা-মার কাছে গিয়ে যদি অপমান বা অত্যাচার কিছু হয় তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, আমি তোমাদের বাড়ি যাবই।'

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। আমরা দামোশের তীর দিয়ে লক্ষ্মীপুরের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম, সেদিন যে অমাবস্যা তিথি তা জানা ছিল না। রাস্তা ঠিক না জানায় অন্ধকারের মধ্যে দামোশের একটি শুষ্ক প্রশাখা অতিক্রম করে নিমতলী গাঁয়ের দিকে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবলা বনের মাঝ দিয়ে শ্মশানে এসে উঠলাম। প্রসন্ন জানালো, রাস্তা ভুল হয়ে গেছে। শ্মশানে পড়ে থাকা শূন্য কলসীগুলিতে বাতাস এক অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করে ভয়ের সঞ্চার করে তুলছে, মনে

হয় যেন কোন মৃতব্যক্তি আজও অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাবলার শুকনো ডালগুলি মৃতাস্থির মত মাঝে মাঝে পায়ে ঠেকছে। অন্ধকারের তীব্রতা যেন ক্রমে বেশী মনে হতে লাগলো। রবারের জুতো ভেদ করে বাবলার কাঁটা পায়ে বিঁধে যন্ত্রণার সৃষ্টি ; উপরন্তু আশেপাশে পরিত্যক্ত বংশদণ্ডে পায়ের আঘাত লেগে মরমর শব্দ উঠছিল এবং ঐ শব্দে দূরে শিয়ালের ছুটাছুটিও বেড়ে চলাতে প্রাণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

কাঁটাবন থেকে বেরিয়ে একটু দূরেই জলভরা দামোশ দেখা গেল, অতিকষ্টে আমরা পথ খুঁজে চলতে লাগলাম। যখন গোপালপুর ষ্টেসনে যাবার রাস্তা ও পাবনা থেকে নাটোর যাওয়ার রাস্তার সন্ধিস্থলে এসে পৌছুলাম তখন রাত্রি বোধ হয় দশটার কাছাকাছি। অল্প দূরেই লালপুর কুঠি, কাছেই প্রবল অত্যাচারী তহশীলদার তারণ সরকার মশায়ের কুঠি। কুঠি অতিক্রম করে প্রসন্ন আমাকে নিয়ে নিকটস্থ একটি মুসলমানের বাড়িতে উঠলো। বৃদ্ধ মুসলমানটি প্রসন্নকে খুবই খাতির যত্ন করলো। ঐ বুড়ো মুসলমান ঝড়ু পরামাণিক। গ্রামের মণ্ডল বা প্রধানকে পরামাণিক বলে।

কুঠির সাহেবদের দয়ায় ঝড়ুর সম্পত্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বেশ হয়েছে। প্রসন্নর মুখে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে বুড়ো ঝড়ু পরামাণিক হেসে হেসেই বললো, 'সাহেবদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করার শক্তি বা সাহস আমার নেই, তবে যদি দেশে সবার উপকার হয়, তাতে আমি দশের বিরুদ্ধে যাবো না।'

বৃদ্ধের বড়ছেলে সিরাজ সরকার বাড়ি ছিল না। আমাদের একান্ত অনুরোধে বুড়ো জানালো, 'সিরাজকে ধাপারী পাঠিয়ে দেবো ' সেখান থেকে লালপুর থানা ছেড়ে বিলমারিয়ার দিকে চললাম। আকাশে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু এসে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন বললো, 'দাদা এ জায়গাটা হচ্ছে ঝাঁপড়ে-বটতলা। এখন অনেক বটগাছ কাটা হয়ে গেছে, নাহলে দিনদুপুরেও সূর্যকিরণ প্রবেশ করতো না। অতীতে বহু নরহত্যা এখানে হয়ে গেছে, এ স্থানটি নরঘাতকদেরই ছিল। বর্তমানে থানা কাছে হয়েছে আর অনেক গাছ কেটে দিয়েছে তাই ঐ নরহত্যা বন্ধ হয়েছে।'

আলাপ করতে করতে অন্ধকারের মধ্যেই আমরা পথ চলছি। কিছুটা আসার পর মনে হল, পথের পাশে বটগাছে কাণ্ডের কাছে বিরাটকায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি প্রসন্নর গায়ে হাত দিয়ে একটু টিপলাম। প্রসন্ন বলে উঠলো,

ভয় নেই, ঐ ডাকাতে-মা কালী, এখনও অতীতের ডাকাতদের বংশধরেরা মায়ের পূজা করে থাকে। মাঝে মাঝে শেয়ালের খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দে অন্ধকার ও নিঃস্তব্ধতাকে ভয়াল করে তুলছিল।

আমরা রাত্রি প্রায় এগারোটা আন্দাজ বিলমারিয়া পৌঁছলাম। প্রসন্নর বাড়ি ঢুকলাম। প্রসন্নর বাবা তখনও কুঠি থেকে ফেরেন নি। বিলমারিয়া কুঠি বেশ উঁচু ভূমিতে, আসল পদ্মা হতে প্রায় দু মাইল দূরে। দূর থেকে এই অমানিশায় কুঠিবাড়িটি আলোকমালায় 'ইন্দ্র-ভবনের' মত ঝলমল করছিল। প্রসন্নদের বাড়ি থেকে কুঠি বেশীদূর নয়।

সদরে প্রসন্নর দাদা ছিলেন, তাঁর সাথেই প্রথম সাক্ষাৎ হল। প্রসন্নর আগমন সংবাদ অন্দরে পৌঁছানো মাত্রই বাড়িতে একটা যেন সাড়া পড়ে গেল, 'প্রসন্ন এসেছে, প্রসন্ন এসেছে!' প্রসন্নর আহ্বানে আমিও অন্দরে প্রসন্নর মাকে প্রণাম করতে গেলাম। আদরযত্নের কোন ত্রুটি হল না।

অল্প কিছুক্ষণ পরে প্রসন্নর বাবা বাড়ি এলেন। আমি ও প্রসন্ন (চোরের মত) তাঁকে প্রণাম করলাম। ইনি হৃদয়নাথ ঘোষ, বড় দেওয়ান মশায়। এ অঞ্চলের সকলেই জানেন এঁর অত্যাচারের কাহিনী, এঁর কঠোরতার বার্তা সকলের হৃদয়েই ত্রাসের সঞ্চার করে রেখেছে। ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু ভক্তি ভিন্ন ভয় করতে পারলাম না। তিনি যে আমার সকল পরিচয় পূর্বেই পেয়েছেন কি করে তা জানি না। তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, 'তোমার বাবা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সিভিল সার্জন ডাক্তার ছিলেন, তুমি ভাল বংশের ছেলে, তোমার দেহের সমস্ত রক্তটুকু তো গভর্নমেণ্টের পয়সায় পুষ্ট, তোমার উচিত নয় গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। জানো, তোমাকে আমি এখনই সমুচিত শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু তুমি আজ আমার বাড়িতে অতিথি! কাজেই কোন কিছু করা ঠিক হবে না, তবে তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'

উত্তরে আমি জানালাম, 'সন্তান বাপ-মার কাছে আসবে এর মধ্যে সাহসের পরিচয় কি?'

অনেকরকম করে আমায় বুঝাবার চেষ্টা করে কোন ফল হবে না দেখে তিনি পরুষকণ্ঠে আমায় বললেন, 'তুমি যেখানে যা খুসী করো, কিন্তু আমার এই সাহেবের এলাকায় কিছু করবে না, প্রতিজ্ঞা করো।'

আমি ধীরভাবে জানালাম, 'তা হয় না। এই কোং অত্যাচার নিবারণের

জন্যই আমার এখানে আসা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, কারণ আমি সম্পূর্ণ অসহায়।'

উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা তোমার যা খুসী করগে যাও! আমাদের ক্ষমতা থাকে তার প্রতিকার করবো, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করো প্রসন্নকে ত্যাগ করবে।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমি প্রসন্নকে একাজে টানি নি, সেই আমাকে টেনে এনেছে। প্রসন্ন যদি আপনাদের কাছে থাকতে চায় থাকুক, আমি মুক্ত কণ্ঠেই জানাচ্ছি তার একাজে আসবার প্রয়োজন নেই। আমি প্রসন্নকে মুক্তি দিলাম।' এরপর রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সদরঘরে দু ঘণ্টা বিশ্রাম করে রাত্রি প্রভাতের আগেই প্রসন্নর বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম।

একা সঙ্গীহীন অবস্থায় শ্রান্তমনে ও ক্লান্তপদে ধাপাড়ী দিয়ে চলে এলাম। সব কথা ঘনশ্যামবাবুকে জানালাম। ঘনশ্যামবাবু বললেন, 'হাঁ এইবার আপনিও পথ দেখুন, দেশের যা দুর্দশা ছিল তার দ্বিগুণ বাড়বে আর কি হবে!'

আমি হাসিমুখেই বললাম, 'আমি তো প্রসন্ন নই, এর শেষ না দেখে কোথাও যাবো না।'

সেদিনই ভেড়ামারা থেকে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, বটতলার সেই বেঞ্চিতে বসে ভদ্রলোক অনেক আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কির পর আমায় জানালেন, 'আজ থেকে আমিও কংগ্রেসের মত ও পথ গ্রহণ করলাম।' (ওই ভদ্রলোকই নদীয়ায় কংগ্রেসকর্মী বিলাসরাম রায় নামে পরিচিত; হলুদবাড়ির বক্তারমল আগরওয়ালার মধ্যম পুত্র)। দশটি টাকা তিনি কংগ্রেসের চাঁদা বাবদ আমার হাতে দিয়ে গেলেন।

মনে মনে প্রতিনিয়ত চিন্তা, কি করে এখানকার অত্যাচার নিবারণ করা যায়। প্রসন্নর আশা তখনও ত্যাগ করি নি। পাঁচ-ছ দিন কেটে গেল, প্রসন্ন ফিরলো না। আমাকে তাড়াবার নানারকম ষড়যন্ত্র চারদিকে চলতে লাগলো। ঘনশ্যামবাবুর ওপর পুলিশ ও সাহেবদের অত্যাচার আরম্ভ হলো। রকম দেখে ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে যুক্তি করেই আমি বাজুবাবু নামে এক ভদ্রলোকের ভাঙ্গাপোড়া বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমাকে ভিক্ষা দেওয়াও বারণ হয়ে গেছে। কেউ কিছু দিতেও পারতো না ভয়ে। রাত্রে গোপনে ঘনশ্যামবাবু রুটি ও ভাজি পাঠাতেন। কখনও কখনও বাথানে গিয়ে দুধ খেয়ে আসতাম। এই সময়

অমিয়নাথ সেন নামে একটি নতুন সঙ্গী লাভ করলাম। সে যে কোথা থেকে এসেছিল তাও জানি না, তবে আমার অনেক কাজই সে করেছে। সাহেবদের এলাকায় ভিক্ষা 'নিষিদ্ধ' ছিল বলে সে বহু দূর গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা নিয়ে এসে আমায় ডাল আলু সিদ্ধ ভাত তৈরি করে খাইয়েছে, আমি না আসা পর্যন্ত সে আমার অপেক্ষায় বসে থাকতো। তার একনিষ্ঠ সেবা ও সাহায্যই আমাকে (ভগবানের দান স্বরূপ) দুর্দিনে বাঁচিয়েছিল। সে অঞ্চলে সকলেরই ধারণা হয়েছিল প্রসন্ন চলে গেছে, সোমেশ্বরও চলে যাবে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ পেলাম, মাঝপাড়ায় গঙ্গাবাজারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য একজন গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। টাকা জমা না দিলে কাছারী থেকে গাড়ি ও মহিষ পাওয়া যাবে না। কয়েকজন গাড়োয়ান এসে আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানালো ঐ গাড়োয়ানকে 'ছাড়' করিয়ে দেবার জন্য। প্রথমে স্বীকার করি নাই, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে, এই অঞ্চলে আমার কাছে এই প্রথম আবেদন। গরীবদের ডাকে যদি না যাই তবে কংগ্রেসের ওপর লোকের আস্থা আসবে কেন?

সন্ধ্যার কিছু পরেই গঙ্গাবাজারে গিয়ে হাজির হলাম। ভিড়ও খুব হয়েছে দেখলাম। আমাকে দেখে সকলেই রাস্তা ছেড়ে দিল, আমি নায়েব মশায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়োয়ানকে কি ক্ষমা করা যায় না?'

তিনি রেগে আমাকে উত্তর দিলেন, 'তোমার সাহসেই তো চাষারা আজ উত্তেজিত হয়ে অন্যায় করতে সাহস পাচ্ছে, তা না হলে বাজারের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালায় কার বাবার সাধ্যি।'

বুঝলাম, সব অনর্থের মূল আমাকে ঠাউরেছেন, একজন্য জরিমানার টাকা আদায় না হলে গাড়ি ছাড়বেন না। যদি টাকা না দেওয়া হয় তবে গাড়ি মোষ নিলামে চড়ানো হবে। হয়তো আমি জরিমানার টাকা দিতাম না, কিন্তু গাড়োয়ান বার বার বলতে লাগলো, 'বাবু আমি গাড়ি বাজারের বাইরেই রেখেছিলাম, মাল আনার জন্য একটু সরেছি, আর সেই সময় মোষদুটি গাড়ি নিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। দেখতে পেয়েই আমি পিঠের বস্তা নামিয়ে রেখে ছুটে এসে দেখি, কাছারীর লোক আমার গাড়ি আটক করেছে। আমায়ও আটকে রেখেছে। নায়েববাবুর হাতে পায়ে ধরে অনেক কেঁদেছি, বলেছি এমন আর কখনও হবে না, উনি কোন কথাই শুনলেন না।'

বহুবার আমিও নায়েববাবুকে অনুরোধ করেছিলাম, এমনকি তাঁর পায়েও ধরেছিলাম। তাতেও যখন মুক্তি পেল না তখন চাঁদার টাকা থেকে পাঁচ টাকা তাঁর পায়ের কাছে রাখতে, তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে অজস্র বকাবকি আরম্ভ করলেন। আমি ঐ টাকা দিয়ে তাঁকে যে অপমানিত করলাম সেটাও জানালেন।

অনেকরকমে বুঝিয়েও নায়েববাবুকে শান্ত করতে পারলাম না। বললাম, 'আপনাকে অপমান করার স্পর্ধা বা ইচ্ছে কিছুই আমার ছিল না বা নেই—শুধু গরীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই এ কাজ করেছি।'

যা হক, ঘটনাটা চারদিকে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। চাষীরা দলে দলে এসে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে লাগলো। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কাইয়ামারী, নিমতলী, ফিলীপনগর, টেলারপুর, বৈরাগীরচর, বাখানবাড়ি, আরামবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, মাঝপাড়া প্রভৃতি গ্রামে ইতিপূর্বে দু-একবার যাতায়াতও করেছি।

ভিখারির বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে দেখে, আমার ওপর সকলেরই একটু দয়ার সঞ্চার হয়েছে। হোসেনী মোল্লা ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে বাখানবাড়ি গাঁয়ে একটি সভা আহ্বান করলাম, কিন্তু হোসেনীদার ছোট ভাই ফুলীদাদা আমায় জানালেন 'ঐ সভায় আপনি একলা যাবেন না, আমরা সবাই সঙ্গে যাবো।'

সভায় পৌঁছবার আগেই দেখলাম চারিদিক থেকেই লোক সভার উদ্দেশে ছুটেছে। সভার নিকটবর্তী হয়ে দেখি, কুঠি থেকে দশ-বার জন অশ্বারোহী বন্দুকধারী পশ্চিমা নগ্দী এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে আরম্ভ করেছে। দূর থেকে আমাকে দেখে আমার দিকে আসবার আগেই, হোসেনীদা আমায় কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে পদ্মার কিনারে ভাসমান নৌকোয় তুলে নৌকা বাইতে আরম্ভ করে দিলো। আমি কিছু বুঝলাম না ব্যাপার কি। হোসেনীদা বললে, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, এখানে সভা-টভা করা খুবই কঠিন, কি জানি যদি আপনাকে আঘাত করে তাই আপনাকে নিয়ে ছুটে চলে এলাম।'

ধাপাড়ী ফিরে মনে দ্বিগুণ উৎসাহ এলো আর যেন জেদটাও বেড়ে গেলো, শ্রীভগবানকে মনে মনে ডাকলাম, কি যে উপায় করবো চিন্তা করতে লাগলাম। শেষে কোনো গাঁয়ে বিয়ে, জলসা, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন কিছু আছে জানতে পারলেই

সেই গাঁয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতাম। ঐ সকল জমায়েতকে কংগ্রেসের সভায় পরিণত করতে আরম্ভ করলাম। আমার এই সন্ন্যাসীর মত ত্যাগ ও একাগ্রতা দেখে ক্রমে ক্রমে সকলেই আমার ওপর আস্থাবান হয়ে উঠলো। কোথাও কোন উপলক্ষ থাকলে 'সোমেশ্বর' নিশ্চয়ই আসবে এটা যেন সবারই জানা হয়ে গেল।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর পর্যন্ত আমার নিয়মিত উপস্থিতি চলতে লাগলো। কুঠি হতে চারিদিকে সংবাদ জারি করা হল 'যার বাড়ি যে কোন কাজ হক না কেন কুঠিতে সংবাদ আগে দিতে হবে, কুঠির নগদীর উপস্থিতিতে ঐ কাজ সমাধা করতে হবে। অন্যথা অত্যাচারের সীমা থাকবে না।'

ঐ খবর বাজুবাবুর ভাঙ্গাবাড়িতে আমার কাছেও এলো, আমার কিন্তু মনের মধ্যে খুবই আনন্দ হলো। আমি দিকে দিকে সংবাদ পাঠালাম 'প্রত্যেক দিনই যেন কুঠিতে সালিশী ও ঘরোয়া আলোচনার সংবাদ দিয়ে কুঠি হতে নগদী পাঠানোর জন্য প্রার্থনা জানানো হয়।' তাই চলতে লাগলো সকাল সন্ধ্যা, দুপুর রাত্রি পর্যন্ত এ-গ্রাম ও-গ্রাম ছুটোছুটি করে বেড়াতে নগদীদের খুবই অসুবিধা হতে লাগলো, তাদের ভোজন ও আরামপ্রিয় শরীর—শরীরে এত পরিশ্রম অভ্যাস ছিল না, তার ওপর কোথায় কতক্ষণ থাকতে হবে তারও তো স্থিরতা নাই, আবার ঘোড়া নিয়ে কুঠিতে ঠিক সময়ে না পৌছুলে, ঘোড়ার খাবার সময় অতীত হয়ে গেলে, কিংবা প্রখর রোদে ঐ সব দামী ওয়েলার ঘোড়াকে খাটানো নিয়ে নগদীদেরই জীবনান্ত হতে লাগলো।

ভেবেচিন্তে আমি একটা নূতন ফন্দি ঠিক করলাম। প্রতি শুক্রবার নামাজের সময়ে আমি মসজিদে যেতে আরম্ভ করলাম। মুসলমান ভাইগণ সাদরে আমাকে মসজিদে স্থান দিতেন ও আমার কাছে কংগ্রেসের বার্তা ও দেশের অবস্থা শুনতেন। কিন্তু প্রত্যেকেই জানাতেন যে 'সাহেবদের হাত থেকে অত্যাচারের রেহাই না পেলে আমাদের দ্বারা কংগ্রেসের কাজ কিছুই হবে না। এ বিষয়ে সকলের মতামত নিয়ে তবে একটা ব্যবস্থা হতে পারে এই কথাই জানাতাম। 'দেশের মঙ্গলের জন্য সকলে আমার আদেশ মানবে' এ প্রতিজ্ঞাও কোরান স্পর্শ করিয়ে করে নিতাম। আমিও ওদের সঙ্গে বসেই শ্রীভগবান্‌কে ডাকতাম, প্রার্থনা শেষে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হতো আগামী শুক্রবার কোথায় কোন্ মসজিদে সমবেত হতে হবে। এইভাবেই আমার কাজ চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে দেড়মাস অতীত হয়ে গেছে। একদিন নগ্দীদের তরফ থেকে একটি সংবাদ এলো এবং যে লোকটি সংবাদ এনেছিল সে সশ্রদ্ধ সেলাম জানিয়ে বললো 'নগ্দীরা হায়রান হয়ে পড়েছে এবং নগ্দীরা প্রায় সবাই মহাত্মাজীর ভক্ত। সেজন্য গান্ধীজীর বেলায় কোন ক্ষতি তাদের দ্বারা হবে না, তবে নগ্দীদের সবিনয় নিবেদন বা অনুরোধ, যেখানে যা খুশি করুন কুঠিতে সংবাদ পাঠাবেন না। বিনিময়ে কুঠিতে যাতে কোন না সংবাদ পৌঁছায় সে চেষ্টাও নগ্দীদের সাথে নীচের আমলারাও করবে।'

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম ও কুঠিতে সংবাদ দেওয়া বন্ধ করলাম।

প্রসন্নকে হারিয়ে একা একা কষ্ট হয়েছিল কিন্তু ভগবান তার বিনিময়ে জাফরুদ্দিন মোল্লা নামে একটি আই. এ. ক্লাশের ছাত্রকে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে পেলাম। নইমুদ্দিন সরদার নামে একটি সাহেবদের বিপক্ষ পার্টিকেও পেলাম। জাফরুদ্দিন ও নইমুদ্দিন আমার দুপাশে থেকে আমায় সব সময় সাহায্য করেছে। রাত্রের অন্ধকারে মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে বেড়ানো ও গুপ্ত সভাসমিতিতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সবই তারা করেছে। সাহেব কোং আমার কাজে যত বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, শ্রীভগবানের দয়ায় ততই আমার উদ্দেশ্য ও প্রচারকার্য, দূরে দূরে নিজে থেকে প্রচারিত হতে লাগলো।

লাঠি হাতে মাথায় পাগড়ী ও একটি এলুমিনিয়মের ঘটি হাতে খদ্দর পরা যুবাকে দেখলেই সে অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা স্তব্ধ হয়ে এসে পথে দাড়াতো 'সোমেশ্বর' এসেছে বলে।

পদ্মার চরের ওপর যতদূর দৃষ্টি চলে সবই সাহেবদের জমিদারীর অধীনে। এই অঞ্চলের শতকরা নব্বই ভাগই মুসলমান। এখানে সোমেশ্বরের একতাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মসজিদে মসজিদে প্রচারিত হতে লাগলো একতার মন্ত্র ছোঁয়াচে রোগের মত। নিজে থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে লাগলো এখানকার মানুষ। আপাতদৃষ্টে মাত্র দশ বারটি গ্রামই তখন পর্যন্ত অর্গানাইজ করতে পেয়েছি।

এই সময়ে সাহেবরা আমাকে সকল রকমে একঘরে করে ফেললো। একমাত্র ঘনশ্যামবাবু ছাড়া অন্য কেউ গোপনে কিছু সাহায্য পর্যন্ত করতে ভয় পেতেন। ভয়ের প্রধান কারণ গঙ্গাবাজারের নায়েবমশায়। কাজের জন্য আমায় চারদিক্ ঘুরে বেড়াতে হয়, কিন্তু ধাপাড়ী না এলে খাওয়া মিলবে না। ঘনশ্যাম

বাবু দিনের বেলায় কিছু দিতেন না, রাত্রে দিতেন গোপনেই, অন্নের আশায় একদিন দুপুরে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পথে বেরুলাম। হয়তো কোন প্রজার বাড়ি গেলে খেতে পেতাম, কিন্তু সেই গরীবের উপর যে কি ভীষণ অত্যাচার হতে পারে তা যেন মানস চোখে দেখতে পেলাম। দামোশে স্নান করে কলাপাতা হাতে নিয়ে আমি ও অমিয় গঙ্গাবাজারের নায়েববাবুরই অন্দরপ্রাঙ্গণে ঢুকে পাতা পেতে, নায়েববাবুর স্ত্রীর উদ্দেশে ডাক দিলাম 'মাগো! খিদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না, দুইদিন উপবাসী, আজও কি উপবাসী থাকতে হবে? আপনার ওপর নির্ভর করেই যে ভিক্ষায় এসেছি।'

জননীর নিকট সন্তানের আকুল আহ্বান! সন্তানকে অন্নদানের আহ্বানে বাংলাদেশের কোন মা কি উপেক্ষা করে থাকতে পারেন। যে হিন্দুজাতি অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে নিজপুত্র বলিদানে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেই হিন্দুজাতির কুলাঙ্গনা কি অন্নদানে পরাঙ্মুখ হতে পারেন?

জননীর আদর আপ্যায়ন ও সস্নেহ পরিবেশনে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলাম। মনে হল এমন তৃপ্তি অন্নব্যঞ্জন কখনও হয়তো খাইনি। মা অন্নপূর্ণাই বুঝি আজ এখানে আমাদের পরিবেশন করলেন। হঠাৎ পিছন দিকে লক্ষ্য পড়ায় দেখি, নায়েবমশায় বারান্দার উপর মোড়ায় বসে নীরবে ধূমপান করছেন। আহারান্তে মা জননীকে প্রণাম করে নায়েবমশায়ের পদধুলি নিতে নায়েবমশায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'সোমেশ্বর! তুমি বয়সে নবীন হলেও আমার মত প্রবীণ বিচক্ষণ জবরদস্ত নায়েবকেও চতুরতায় হার মানালে।' নায়েবমশায়ের কথায় আমি যুগপৎ স্তম্ভিত হলাম ও চমকে উঠলাম। তিনি বলতে লাগলেন, 'এতদিন পর্যন্ত চাল দিয়ে পরাস্ত করতে আমায় কেউ পারেনি, আজ তুমি একচালেই এই বুড়োর কিস্তি মাত করে দিয়েছ। আমি যে অস্ত্র তোমার জন্যে ব্যবহার করেছি সেই অস্ত্রে আমার সর্বনাশ হলো! তোমার মত ধূর্ত ও ফন্দিবাজ যুবক আমি জীবনে দেখি নাই।'

নায়েবমশায়ের উচ্চারিত 'আমার সর্বনাশ হলো' কথায় আমি বড়ই মর্মাহত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'নায়েব মশায়, সর্বনাশ কি হল? সর্বনাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমি আসি নি। সত্যই কি আপনার সর্বনাশ করলাম?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার উদাস ব্যথিত ভাবটি লক্ষ্য করে বললেন, 'সোমেশ্বর! তোমাকে দেখলে স্বতঃই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার সরলতা ভরা মুখ

দেখলে বিশ্বাস হয় না কোন ফন্দি বা চালবাজি করে তুমি এসেছো। বুঝেছি, ভগবানের ইঙ্গিতেই তুমি খিদের জ্বালায় আমার বাড়ি এসেছো। আমি ভিন্ন অন্য কেউই অন্ন দিতে সাহস পেতো না। তোমাকে অন্ন দিয়ে আজ আমার অন্ন এখান থেকে উঠলো। আমার শত্রু হয়ত এতক্ষণে সাহেবের কাছে এ সংবাদ জানাতে ছুটেছে। আগামী কালই আমাকে জবাব দেওয়া হবে; ধর্মরক্ষা করতে গিয়েই আমার চাকরিটা গেল, এটাও আনন্দের কথা! চাকরি আমার যেতোই, কারণ তোমার একাগ্রতা ও সাধুতার প্রভাবে এ অঞ্চলে একটা নতুন প্রাণের সাড়া পড়ে গেছে। শিগগিরই একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত অত্যাচার ও অত্যাচারীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সাহেব সরকার তোমায় যতই বাধা প্রদানের চেষ্টা করছেন, ততই তাদের মরণের পথ পরিষ্কার করছেন। আমি তো এ পথ ধরতে সাহেবদের নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু ওঁরা আমার কথা শুনলেন না।'

আমি তাঁকে বার বার প্রণাম জানিয়ে বললাম, এতদূর অনিষ্ট হবে জানলে এ পোড়া পেটের জন্য কিছুতেই মায়ের কাছে আসতাম না। আজকের এই ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত ও মর্মাহত। যদিই-বা কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে এসে থাকি, 'দধীচি মহামুনি' আজও তাঁর মেরুদণ্ডদানে সমর্থ জেনে আমার ভুল ভাঙ্গলো। আমারই সমধিক লজ্জা পাবার কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

নায়েবমশায় সস্নেহে আমাকে আশীর্বাদ করলেন 'তুমি জয়যুক্ত হও! তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক!'

আমি দুঃখিত মনে সেখান থেকে চলে এলাম। মনে মনে শ্রীভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, 'ঠাকুর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!'

প্রকৃতই নায়েববাবু যা বলেছিলেন তাই হলো। চারদিকে সংবাদ রটে গেল, নায়েববাবু আমাদের ভিক্ষা দিতে বারণ করেছেন, অথচ গোপনে সোমেশ্বরকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে তিনি নিজেই খাওয়াচ্ছেন। আমি শত চেষ্টা করে এই কথা বলা বন্ধ করতে পারলাম না। সাহেবদের কাছেও এ কথা পৌঁছুতে দেরী হল না। নায়েব মশায়ের জবাবদিহি আরম্ভ হয়ে গেল।

এই ঘটনার দু-দিন পরেই দু-তিন জন লোক এসে জানালো, আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন। সাহেব কোং প্রকাশ্যেই কুঠিতে ঘোষণা করেছেন, যে সোমেশ্বরের মাথা এনে দেবে তাকে দুহাজার টাকা বকশিষ দেওয়া হবে। পরামানিকরা

আমাদের পাঠিয়েছে কথাটা আপনাকে জানাবার জন্য এবং এখন থেকে চলে যাবার অনুরোধও জানিয়েছেন। 'কিছু পরেই আবার ঘোড়ায় চেপে একজন এসে ঐ অনুরোধই জানালো, 'চলে যান এখান থেকে।'

আমার অন্তরের মধ্যে বিবেক বাধা দিল, 'কাপুরুষের মত পালিয়ে যেও না।' আমি মন্ত্রচালিতের মত ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠে বসে বললাম, 'আমায় এখনি দামোশ পার করে দাও, আমি এখনি চড়পথে বিলমারিয়া যাবো।'

উপস্থিত সকলেই বাধা দিতে লাগলো। 'সাহেবদের মাইনে-করা লাঠিয়াল আছে, আপনার সেখানে যাওয়া হবে না।'

আমি জানালাম, 'আমার যদি সাহেবদের লাঠিয়ালের হাতে মরণই থাকে কেউ তা রোধ করতে পারবে না। মিছামিছি কাপুরুষের মত ভয়ে পালাবো কেন?'

আমার কথা শুনে তারা যেন কতকটা স্তম্ভিত ও অবাক হয়ে আমাকে দামোশ পার করে দিয়ে সঙ্গে যেতে চাইলো। আমি তাদের অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম। তারা দুঃখিত অন্তরে চলে গেল। আমি একাই বিশ্বজননীকে প্রণাম করে পথ চলতে লাগলাম।

যেখান দিয়ে যাই সবার মুখে ঐ এক কথা, 'আপনাকে খুন করার হুকুম হয়েছে। দেশের সব লোকই তা শুনেছে, শুধু আপনি শোনেন নি। আপনি আর আগে যাবেন না, ফিরে চলুন!'

সকলকেই বললাম, 'খুনের হুকুম শুনেই তো যাচ্ছি। কে খুন করবে সেটা জানার জন্যই কুঠিতে যাচ্ছি। তোমরাই যদি আমায় খুন করো তাতেও দুঃখ কিছু নেই।' সকলে আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। এইভাবে সকলকে শান্ত করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করলাম। সর্বত্রই ঐ একই কথা, অথচ খুন করতে কেউ আসে না। আরও একক্রোশ পথ চলার পর একটি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তাটি প্রস্থের দিক থেকে কেটে অন্য একটি ছোট রাস্তা চলে গেছে পদ্মার দিকে। ঐটি গ্রামের ঘাটের রাস্তা। গাঁয়ের মেয়েরা স্নানান্তে পূর্ণকলসী কাঁধে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে ফিরছিলেন। বেশীর ভাগই মুসলিম মহিলা, দু-একজন হিন্দু নারীও আছেন। কি কথা আলোচনা করতে করতে তাঁরা আসছিলেন, আমাকে দেখে আমার গন্তব্য পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা আমায়

বললেন, 'ভাইজী। আপনি কি সাহেবদের হুকুম শুনেন নাই? আজ আর আপনার ওপথে যাওয়া চলবে না, আপনি ধাপাড়ী ফিরে যান।'

জানালাম 'সাহেবদের হুকুম শুনেই তো যাচ্ছি, দেখি কে আপনাদের ভাইকে খুন করে! আজ আমার কুঠিতে যেতেই হবে। আশীর্বাদ করো মায়েরা বোনেরা, যেন আমার কোন ক্ষতি না হয়।'

ধীরে তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই পথে, যতদূর দৃষ্টি চলে আমার প্রতি লক্ষ্য রেখে। পিছন ফিরে ঘরে ফেরার ইসারা জানিয়ে আমি চলতে লাগলাম। বেলা সাড়ে দশটার আন্দাজ কুঠির সামনে বাঁধাঘাটে হাজির হলাম। ঘাটে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কেউই আমায় কোন কথা বলল না বা আমার কেশস্পর্শও করল না।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ধাপাড়ী অভিমুখে রওনা হলাম। লালপুর থানা হয়ে গৌরীপুর; পাল্টে দিয়ে গঙ্গাবাজার হয়ে বেলা দুটোর সময় ধাপাড়ী ফিরলাম। পথে সকলকে অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকতে আর ঐ একই কথা আলোচনা করতে শুনলাম, কিন্তু কেউই আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। ফেরার পথে অনেকেই আমার সঙ্গে এলো এবং আমার নির্দেশ মত কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। সাহেবরা আমায় যে একঘরে করেছিল সেসব কোথায় 'চুরমার' হয়ে গেল। সেই থেকে আমার খাওয়ার কোন কষ্ট আর রইল না। এই সময় তাঁতিবন্দের তিনজন কংগ্রেসকর্মী এসেছিলেন, তাঁরা ধাপাড়ীতে এসে আমায় নদীয়া এলাকায় নিয়ে যাবার জন্য ভেড়ামারার বিলাসবাবুর অনুরোধ নিয়েও এসেছিলেন। বিলাসবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। এই সময় ইলাহী বক্স নামে একটি নতুন কর্মীও পেলাম। এখানকার সমস্ত কাজের ভার নইমুদ্দিন সরকার জাফরউদ্দিন ও ইলাহী বক্সের আর অমিয় ভাইদের উপর দিয়ে আমি ভেড়ামারা রওনা হলাম।

তিন

সেদিন হাটবার। ভেড়ামারা হাটের ওপর একটি সভা করে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করলাম। তারপর বিলাসবাবুর আড়তে খাওয়া শেষ করে গো-যানে হলুদবাড়ি রওনা হলাম। ভেড়ামারা থেকে হলুদবাড়ি ছয় ক্রোশ দূর। হলুদবাড়ি পৌছতে যখন মাত্র এক মাইল বাকি তখন শুনলাম ও দূর থেকে দেখলাম যে

হলুদবাড়ি গঞ্জেই আগুন লেগেছে। আমরাও গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঐ আগুন লক্ষ্য করেই ছুটলাম। পনের মিনিট ছুটে সেখানে পৌঁছে জানলাম, বিলাসদার এক আত্মীয়ের গোলায় আগুন লেগেছিল, এখন সে আগুন প্রায় নিবে এসেছে। আমাদের কোন সাহায্যের দরকার হল না।

বিলাসবাবু ও তাঁর সহোদর উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হলুদবাড়িতে শুনলাম রিফাইতপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের গোলমাল চলছে। হলুদবাড়ি থেকে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে রিফাইতপুর রওনা হলাম। যাওয়ার পথেই শুনলাম রিফাইতপুরের কাছেই একটা মাঠের মধ্যে সভা হবার কথা আছে। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। দুই-পাঁচ জন করে বহু লোক সেই বাবলাগাছওয়ালা ডাঙ্গায় জমায়েত হলেন। যদিও তাঁরা আমায় দেখেন নি, শুধু প্রায় সকলেই আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আমার সঙ্গী দুজন আমার পরিচয় দিতেই সকলেই আমাকে ভালভাবেই গ্রহণ করলেন। সকলেই যেন কার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ একটি কালো টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পৌঁছানো মাত্র কয়েকজন বলে উঠলো, 'ইন্দু! সোমেশ্বরবাবু এসেছেন।' একথা শোনার পর ইন্দু শান্তভাবে আমার দিকে তাকালো। ক্ষেপা হাতি হঠাৎ মাথায় অঙ্কুশের আঘাত পেলে বুঝতে পারে তাঁর উপর একজন চালক মাহুত বসে আছে। মনে হল ইন্দুর অবস্থা যেন কতকটা তেমনি।

ইন্দু আমায় প্রণাম করে বললো, 'দাদা! এসেছেন? এই গরীব ভাইয়ের ডাক কানে পৌঁচেছে? এবার আপনি চালান। আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আজ আমার ধর্মঘট আরম্ভ করবার শেষ দিন। ঠিক দিনেই আপনি এসেছেন।'

ভাবলাম শ্রীভগবান আগেই সব ঠিক করে রেখেছেন আমার জন্য। আমি ইন্দুকে আলিঙ্গন দিলাম। আমাকে সভাপতি করে সভা আরম্ভ হল। ইন্দু অশ্বারোহণে আধ ঘণ্টার মধ্যে চারদিকে সংবাদ দিল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে স্থানটি জনসমাগমে ভর্তি হয়ে গেল। ধর্মঘট বন্ধ করার কোন পথ তখন আর ছিল না। সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধেই প্রজাদের অভিযোগ এবং তাঁর বিরুদ্ধেই প্রধানত ধর্মঘট আরম্ভ হয়। আমি না এলে ঐ ধর্মঘটে প্রজারা বহু অত্যাচার

করতো, কিন্তু ভগবানের সে ইচ্ছা নয়। তাঁরই ইচ্ছায় আমি সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি না থাকলে হয়তো সুরেন্দ্রবাবুকে আক্রমণও করতো। জানলাম, দেশী জমিদার হলেও সাহেব কোং-এর পাশাপাশি থেকে সুরেন্দ্রবাবুও সাহেবদের অত্যাচারের অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে এই প্রজা বিদ্রোহ! দেরী করে আসার জন্যই আমি ধর্মঘট বন্ধ করতে পারলাম না। ধর্মঘটের নামে সেসব অধর্ম অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা ছিল মাত্র সেটুকু বন্ধ করতে পারলাম। আমি এখানে পৌঁছিবার আগে যে সকল অন্যায় হয়ে গেছে তার জন্য কি করতে পারি?

রাত্রে ইন্দুর সঙ্গে তাদের বাড়িতেই থাকা খাওয়া ব্যবস্থা হল। পরদিন সকালে উঠে ঐ অঞ্চলের মণ্ডল ও পরামাণিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম যদি কোন উপায়ে প্রজা ও জমিদারের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারি। প্রজারা এমন সব অন্যায় দাবীও জানাতে লাগলো যার মীমাংসায় আসতে আমাকে খুবই বেগ পেতে হল। অবশেষে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে একটি পেশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে শান্ত করলাম।

বড় তরফের কাছারী রাস্তার ধারে। ছোট তরফকে খবর দিলাম যে আজ সন্ধ্যায় বড় তরফের কাছারীর সামনে যে খোলা মাঠ আছে সেই মাঠে জমিদার আর প্রজাদের মিলিতভাবে একটি সভা হবে। সভায় সকলে দয়া করে উপস্থিত হলে, আশা করি বিবাদ মিটে যাবে।'

দুপুরবেলা আমি রিফাইতপুর থানায় ইনেসপেক্টর অবিনাশচন্দ্র মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমে তিনি রুক্ষস্বরেই আমায় কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমার কাছ থেকে যখন নম্রভাবে তার উত্তর পেলেন তখন তিনি কি জানি কি ভেবে বললেন, 'সোমেশ্বর, আমি যদি তোমায় এখন গ্রেপ্তার করি?'

উত্তরে বললাম, 'যা খুশী করতে পারেন। তবে জেনে রাখুন, এই প্রজা বিদ্রোহ আমি ঘটাই নি, বরং এর তীব্রতা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাদের অনেক কিছু বলার আছে।'

তিনি আমার কথা স্বীকার করলেন এবং আমাকে বললেন, 'এই প্রজা-বিদ্রোহে তুমি থেকো না। আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে আমার এই থানা এলাকায় কোন কিছু করবে না। তুমি অন্যত্র গিয়ে কংগ্রেসের কাজ করো।'

আমি উত্তর দিলাম, 'সে প্রতিজ্ঞা আমি কি করে করি বলুন? আমি

মেদিনীপুর সাহেব কোং অত্যাচার দমন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনি যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন, তবে সেই স্বার্থে আমি বর্তমানে রিফাইতপুর ত্যাগ করতে পারি। আপনি নিজে আমার প্রতিনিধি হয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে প্রজাদের মীমাংসা করে দেবেন, পুলিশের কবলে ফেলে অযথা অত্যাচার করবেন না, এই ক'টি কথার প্রতিশ্রুতি দিলেই আমি চলে যাবো।'

তিনি সানন্দেই সাহেবদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো শুনে তিনি মহাখুশী হলেন। আগেই পাবনা ও রাজসাহী এলাকার আমার কাজের সংবাদ পুলিশমহলে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি সুরেনবাবু ও প্রজাদের মীমাংসার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

থানার সাথেই একটি বড় পুকুর। ঐ পুকুর পারেই তাঁর বাসা। আমাকে স্নান করতে বলে তিনি বাসায় গেলেন। স্নানান্তে থানায় বসে ভাবছি কি করবো, তখন একজন জমাদার এসে আমাকে অবিনাশবাবুর বাসায় নিয়ে গেল। বাসায় গিয়ে দেখলাম অবিনাশবাবুর দয়াময় রূপ! মৃতদার—সংসারে একটি ন-দশ বছরের কন্যা ও তার চাইতে ছোট একটি পুত্র আর পাচক ও ভৃত্য ব্যতীত অন্য কেহ নেই। কন্যাটি দেখতে দেবকন্যার মত। আমাকে দেখে দুজনেই ছুটে এলো। আমি দুজনকেই আদর করলাম। খেতে বসে অবিনাশবাবু তাঁর সংসারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে জানাতে লাগলেন। তিনি এক সময়ে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। আহারান্তে বিশ্রামের সময়ে তাঁর যৌবনকালের অনেক ঘটনার কথাও বললেন।

ক্রমে বেলা চারটে বাজলো। ইন্দু ভিন্ন স্থানীয় কেউই জানতো না আমি কোথায় আছি। ইন্দু বিকেলে আমাকে থানায় ডাকতে এলো। অবিনাশবাবু ইন্দুকে অযথা তিরস্কার করলেন এবং সকলের সামনেই বললেন, 'সোমেশ্বর সমেত সমস্ত পাণ্ডাগুলোকে জেলে পাঠাতে হবে।'

আমি অবিনাশবাবুকে প্রণাম করে সন্ধ্যায় সভায় উপস্থিত হবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি বললেন, 'তোমার সন্ধ্যার সভায় না গেলেই কি চলে না?'

আমি উত্তর দিলাম, 'এ সভা যে আমিই ডেকেছি, কাজেই আমাকে থাকতেই হবে।'

অন্য কোন কথা হল না। তিনি থানায় উচ্চ প্রাঙ্গণের মাঝে একটি চেয়ারে বসে রইলেন। ছেলে ও মেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'কাকা, রাত্রে আসবেন তো?' অবিনাশবাবুও আমার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। আমি থানা থেকে চলে এলাম।

সন্ধ্যার পর সভা আরম্ভ হল। লোকে লোকারণ্য, জমিদারদের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুর দেখা নেই। বার বার খবর পাঠিয়েও তাঁকে সভায় আনা গেল না। সেই তেজোদৃপ্ত জমিদার আচার্যের আত্মসম্মানে আঘাত লাগার ভয়েই হয়তো সভায় আসেন নি। সভায় বিশেষ কোন কাজই হল না, ফলে ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করলো।

রাত্রে ইন্দুর বাড়িতে খাওয়া শেষ করে, ইন্দুকে গাঁজা ত্যাগ করতে বিশেষ অনুরোধ করলাম ও শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বলে হলুদবাড়ি চলে এলাম। পরদিন ভেড়ামারা হয়ে পুনরায় ধাপাড়ীতে হাজির হলাম।

বাজুবাবুর আড়তবাড়ির সামনে মজর পরামাণিকের আড়তবাড়ি। ধাপাড়ী এসেই শুনলাম যেদিন আমি ভেড়ামারা রওনা হই সেইদিন রাত্রেই কে বা কারা এসে ঐ পোড়ো বাড়িতে হানা দিয়ে আমার কাগজপত্র, হাঁড়ি কলসী সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। আমি না থাকায় অমিয় ঘনশ্যামবাবুর আড়তবাড়িতে শুয়েছিল। সবাই বলতে লাগলো, ভগবানের অপার অনুগ্রহ আপনারা কেউ সেরাত্রে ওখানে ছিলেন না। যাই হোক, 'একঘরে' করার ভয় আর নেই তাই আবার হাঁড়ি কলসী নিয়ে সংসার পাতলাম। সন্ধ্যায় দামোশের তীরে বসে ভাবছি কি করা যায়, আচম্বিতে সেই সময়ে আমার মমতাময়ী জননীর মুখখানি স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। বহুদিন গৃহছাড়া, আসার সময় মায়ের কোন মতামতের অপেক্ষা না করেই চলে এসেছি। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে মাকে প্রণাম জানালাম।

আমার জন্য সব জায়গার কংগ্রেস কমিটির এক নতুন বিপদ উপস্থিত হলো। কারণ জমিদার ও প্রজাদের বিরোধের মাঝে কংগ্রেসের আসা উচিত নয়, আমি তাই করেছি। আমি কংগ্রেসের সেবক ও প্রচারক আর সেই সূত্র ধরেই এসেছি। প্রচারকার্যেও তাই জানাচ্ছি (তখন পর্যন্ত আমি কংগ্রেসের সভ্য নই), অথচ বর্তমানে যে কাজ করছি তা কংগ্রেস কর্মতালিকার বহির্ভূত। মনে মনে চিন্তা করলাম, দাশ মহাশয় তো তখনি বলে দিয়েছেন, কংগ্রেস তোমায় পাঠাচ্ছে না, আমি তোমায় পাঠাচ্ছি।

এই সময়ে এ অঞ্চলে বিলাতী যব পাকতে আরম্ভ করেছে। সাহেব কোং সমর বিভাগের সঙ্গে ঠিকা নিয়েছেন যব যোগান দেবার। যব গাছ মণদরে বিক্রয় হয়। ফলে যব গাছ জমির গা ঘেঁসে কাটা হয়, এমনকি ত্নু-তিন আঙ্গুলও রাখা হয় না। কাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই আঁটি বাঁধা হয়ে থাকে। এক সঙ্গে সমস্ত মাঠের যব পাকে না, যখন যেখানে যেটুকু পাকে সাথে সাথে তা কেটে তোলা হয়। এক এক গাঁয়ে দুশো থেকে পাঁচশো বিঘা পর্যন্ত জমি থাকে। ফলে গাঁয়ে গাঁয়ে তখন মানুষ ও গরুর-গাড়ির কাজের তাড়া পড়ে যায়। দিনরাত যব গাছ কাটার কাজ চলতে থাকে।

একদিন বাথানবাড়িতে বসে আছি। তখন খুব ভোর। একজন ঘোড়সওয়ার নগ্দী রাস্তার দু-ধারের বাড়িগুলির দরজায় একটি করে তামার পয়সা ছুড়ে দিয়ে গৃহস্বামীকে কাজে বেরুবার জন্য আদেশ দিচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্রামখানি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাস্তে হাতে গাড়ি নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হলো। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ! একটানা স্রোতে সকলেই মাঠের দিকে চলেছে। প্রসন্নর মুখে এ খবর শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আজ সে সুযোগ পেলাম। এটা হলো বেগার—ছুঁড়ে দেয়া ঐ একটা পয়সা একটা গৃহস্থের দাদন বা মজুরী। যতদিন ঐ গ্রামের যব কাটা শেষ ও গাড়ি বোঝাই আর কুঠিজাত না হবে ততদিন এই একই দৃশ্য চলবে। যেদিন প্রথম এই দৃশ্য দেখলাম সেদিন আর একটি ঘটনাও দেখলাম।

একটি বাড়িতে মাত্র তিনটি প্রাণী—স্বামী স্ত্রী ও একটি শিশুসন্তান। পয়সা পড়তেই পরামাণিকের স্ত্রী ছুটে এসে জানালো, 'আমার স্বামীর নিউমানিয়া হয়েছে, মরণাপন্ন অবস্থা। এই ছেলে ও রোগী নিয়ে আমি সব সময় ব্যস্ত রয়েছি। নগ্দীকে বলেকয়ে ঐ পয়সা ফেরত করাতে না পারলে অসুস্থ স্বামী-পুত্রের জীবন যায়।'

এটা তো খুবই সাদাসিধা ব্যাপার। আমি নগ্দীকে জানালাম, 'পয়সা ফিরিয়ে নাও।'

নগ্দী জানালো, 'সে নিয়ম নেই। কুঠিতে এক টাকা চার আনা নজরানা দিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দরবার করতে হবে। সাহেবের দয়া হয় তো তা ফেরত হবে, না হলে স্বামী-পুত্রকে ফেলে রেখে ঐ যুবতীকেই ঐ মহামূল্য তামার পয়সার সম্মান রক্ষা করতে হবে।'

নগ্দী আরও বলে গেলো, 'নজরাণার পয়সা যোগাড় করতে না পেরে বহু রোগীকে কাজে যোগদান করতে হয়।'

উঃ! কি দুর্জয় শাসন! টুঁ শব্দটি করার উপায় পর্যন্ত নাই। আমি ক্ষুণ্ণমনে ধাপাড়ী ফিরে এলাম।

সাহেবদের পাইক, নগ্দী ও বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে প্রায়ই নালিশ আসতে লাগলো। একদিন একটি বারো বছরের ছেলেকে রক্তাক্ত দেহে তার বাবা মা আমার কাছে এনে হাজির করলো। নগ্দীদের মারের নমুনা দেখলাম, এতটা ভীষণ জানতাম না। তারা জানালো, মারের সংবাদ যেখানেই পান, ঠিক এই ধরণেরই হয়। ছেলের অপরাধ দু-তিন কাঠা জমিতে সে যব গাছ কাটার সময় চার-পাঁচ আঙ্গুল গোড়া জমিতে রেখে গাছ কেটেছে।

'মাফ করুন, আর হবে না' ইত্যাদি বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সমানে চাবুক চলছে। ছেলেটির বাবা মাও ছেলের সঙ্গে কাঁদছিল। ছেলেটির কাপড় খুলে দেখি ইংরাজী X-এর মত সমস্ত পিঠের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কেটে গেছে। রক্ত ঝরা তখন বন্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাদের কান্নায় সমস্ত জায়গাটা যেন ভরে উঠেছিল। আমার কাছে প্রতিকারের প্রার্থনা জানালো। ছেলেটির ওষুধের ব্যবস্থা করে সকলকে বিদায় দিলাম। বহুক্ষণ ধরে শ্রীভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালাম। কি করি, ঠাকুর তুমি উপায় বলে দাও! অন্তর থেকে কে যেন বলে দিলো 'ধর্মঘট করাও।'

মন আনন্দে নেচে উঠলো। তখন আমার সভা বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকলেও পুলিশের অত্যধিক ঘোরাফেরা করার জন্য প্রকাশ্যে বড়রকম সভা করতাম না।

এই সময় লক্ষ্মীপুরের বাগচী মহাশয় ও গৌরীপুরের আবদুল করিম মিঞা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমি জানতাম না যে ছায়ার মত সি, আই, ডি পুলিশ গোপনে আমার অনুসরণ করতো। পরে এরকম সংবাদও আমার কাছে পৌছুলো যে, আমার সুহৃদ ও সহোদরোপম অমিয় ভাইটিও পুলিশ কর্তৃক আমার খবর আদান-প্রদানের কাজে নিযুক্ত। আমি কিন্তু সেকথা আজও বিশ্বাস করতে পারি না। তবে সে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই একদিন চলে গেল। তার কোন পরিচয় আমি জানতাম না, জানতে চাইনিও কোনদিন। সে যাই হক, সে আমার সেবা ও সাহায্য যথেষ্ট করেছে। এক সময় অন্নদাতা,

পরামর্শদাতা এমনকি জীবনদাতা ছিল বললেও ভুল বলা হবে না। এই সুদীর্ঘ জীবনে অমিয়ের বহু খোঁজ করেছি, কিন্তু সন্ধান পাই নি। তার সেবা ও যত্ন নিয়েছি, কিন্তু তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসর পাই নি। তার দেখা আর কখনও পাবো কি না তাও জানি না।

গৌরীপুরের বাগচী মহাশয় সি, আই, ডির খবর আমাকে ঠিক দিয়েছিলেন। কারণ.তাঁর বাড়িতেই একরাত্রি সি, আই, ডি ভদ্রলোক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই ভদ্রলোক বাগচী মশাইকে কিছু কিছু আভাস দিয়েছিলেন।

আমার মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তাই স্থান পেতো না। প্রতিনিয়ত ঐ অঞ্চলের উর্বর শ্যামভূমি। দৃশ্য ও সরল মূক জনসাধারণের অসংখ্য করুণ ছবি ছায়াচিত্রের মত অন্তরে ভেসে বেড়াতো। একমাত্র চিন্তা কি করে ঐ বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটানো যায়। পুলিশ বা সি, আই, ডি কে কোথায় কি করছে না করছে সেকথা মনে স্থানও পেতো না।

এই সময় আমি বাংলা গবর্নমেণ্টকে 'তার' করলাম এই অঞ্চলের অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। এ কথাও জানালাম, 'অচিরে তদন্ত না হলে ধর্মঘট হবার সম্ভাবনা'। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। জ্বরের প্রথম প্রকোপে দুদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় কেটেছে। তৃতীয় দিন সিরাজ সরকার লোক পাঠিয়ে জানালো, 'লালপুর থানায় রাজসাহী থেকে জেলাশাসক Mr. R. N. Read এসেছেন। আমি আর দেরী না করে একটি খোলা গরুর গাড়িতে শুয়ে লালপুর থানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যখন থানার গাছতলায় পৌছুলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটার মত। থানার খোলা প্রাঙ্গণের মধ্যেই পঞ্চাশ-ষাট জন সশস্ত্র পুলিশ রয়েছে, পাশের বাংলোয় স্বয়ং জেলাশাসক।

শুনলাম শাসক মহোদয় একা ঘোড়ায় চড়ে চরের প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিলেন। আরও শুনলাম যে, স্থানীয় বহু পরামাণিককেও ডাকা হবে তাদের প্রতিটি অভিযোগের সাক্ষ্য নেবার জন্য। আমিও লোকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠালাম, যাতে বেলা চারটের আগেই পরামাণিকরা হাজির হতে পারে সাহেবের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য লালপুর থানায়।

লালপুর থানার এস. আই. নূরুল হক সাহেবের মাধ্যমে শাসক মহোদয়ের

কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্রার্থনা জানালাম। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে অনেক জল্পনাকল্পনার পর আমাকে ডাকা হলো। আমি জ্বর নিয়েই কোনরকমে তাঁর কাছে হাজির হলাম।

Mr. Read সাহেব তখন বাংলোর বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় শুয়ে বিশ্রাম করেছিলেন। আমি তাঁকে অভিবাদন করতেই তিনি সোজা হয়ে উঠে বসে আমাকে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

Mr. Reed—Who are you ?

আমি—I am a Congrees worker. My name is Someswarprosad Chowdhury. It was my Telegram to his excellecy the Governor of Bengal which set forth one immediate enquiry about the Zaminday Oppressions in this circle.

Mr. Reed—Who has sent you here to send such Telegram.

আমি—My chief Mr. C. R. Das.

Mr. Reed —Will it be wrong if I say that it is only your instigation that has one false charge against this Company.

আমি—It will be proved presently by the witness of the headman of this locality.

Mr. Reed—Surely, but I hear that you are trying to get the tenants into a general strike against the Company. Is it a fact ?

আমি—Yes, if I cannot get any remedy through your honour or your honour's Government, then there is no other alternative to me.

Mr. Reed—But you are going against the Congress Mandate.

আমি—In my opinion it is the bounden duty of a Congress worker to fight with every wrong and every oppression, moreover when it concerns the dumb pasantry under the tyranny of a strong and powerful company.

Mr. Reed—You are thereby framing animosity between the Tenants and the Zaminders. There are good many native Zaminders who are also expected to be affected, will you get support from the local Congress Committee or from Mr, C. R. Das, your leader ?

আমি—I know well that I won t get support from Congress side but experiences which I have already gathered from my work in the actual field, demands that the Conrgess should immediately take up the tenant's movement and I am sure that the Congress leaders will one day rectify their mistake and will support this movement, but at present I have got the personal support from Mr. C, R. Das and I am not under any Congress Committee but under Mr. Das's direction.

Mr, Reed—Are you fighting against these European Zaminders only because they are not your Countrymen ?

আমি—No, certainly not. The Congress has got no complains against the Europeans individually—it is the very system of Government against which the Indian National Congress has launched this non-violent non-co-operation. To speak sincerely, I have got no grievances against any of the Europeans—working under this Midnapore Zamindary Company but I cannot support the very administration of the Company—the very policy of Tragedy and oppression,

Mr. Reed—You must remember that we are bouud to follow the system of Government we are serving. You can't expect any change in us untill and unless you can change the system altogether. You can't be angry with us if we cannot satisfy you more.

আমি—Certainly not—but to a greater extent the present situation can be mended if not ended by the high Government officials, if they try only to do any Justice to their duty.

Mr. Reed সেই সময়ে আমার পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, You are claiming to be a Congress worker but you are not using the Khaddar.

আমি—I am away from home with only one cloth of khaddar and the chaddar of Indian silk. That cloth is very dirty now, I cannot use that dirty cloth before you, so I had to change that. This mill-made cloth which you see is taken from a villager here. I can assure your honour that I do use khaddar.

কংগ্রেস, দেশ ও আমার নিজের বিষয়ে অনেক কথা হওয়ার পর তিনি আমায় জানালেন যে আমার সম্বন্ধে সমস্ত খবরই তিনি পুলিশের নিকট পেয়েছেন এবং Medical College-এ পুনরায় ফিরে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেন। আমি সসম্মানে তাঁকে জানালাম, 'তা আর হয় না। যে কাজ গ্রহণ করেছি, তা যদি তিনি দয়া করে ঠিক করে প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করতে পারেন, তবেই কলেজে ফেরার কথা চিন্তা করতে পারি। অন্যথায় তা চিন্তা করাও পাপ। এই সময় সামনের চড় থেকে পঙ্গপালের মত জনস্রোত আসতে দেখে Mr. Reed একটু ঘাবড়ে গিয়ে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমায় বললেন, 'Chowdhury, my friend, what are these ? What for they are coming here ?'

আমি—They are the Tanants of Midnapore Zamindery Company Ltd. They are comming to your honour to give depositions during your enquiry,

Mr. Reed—I did not call them, why are they coming here ?

আমি—I have called them here to prove that the charges against the company are all true.

Mr. Reed—Thousands and thousands are coming to this thana office. I am afraid if they make any breach of peace, who will be responsible for that ?

আমি—The European officers of the company and the high Government officers by whose negligence this oppression could take up a dreadful shape.

Mr. Reed—You have called them here, therefore you should be responsible for these actions.

আমি—I know your honour will make me responsible for such kind of actions but will your honour be pleased to judge the following situation and answer as a judge, on whom would your honour like to throw the responsibility ? "Just think one man puts a stone weight on a few strips of papers and keep them under it for a longtime and then one day another man comes and removes the weight all on a sudden and the strips begin to fly in the air. Now tell me Mr. Reed who is to be responsible for the scattered condition of the paper strips ? Whether the man who first put the stone on the paper or the man who removed it ?

Mr. Reed—The man who removed the stone should be responsible.

আমি—No, that can't be. The man who had put the stone on the papers should be responsible

Mr. Reed—What do you mean by this ?

আমি—I mean sir, it is only the out-burst of pent up feelings of the long oppressed and nothing else.

Mr. Reed—May be, but you are the direct instrument through whose voice these tenants have got the language to speak of.

আমি—If your honour thinks so, I will say the responsibility goes on me for bringing of the tenants over here, but who is going to be responsible for the "Sahebs over here"

Mr. Reed—What do you mean by this ?

আমি—I mean, if the 'Sahebs' of the company caused to do any self-implicated wound and came to your honour to complain for breach of peace then who is going to give guarantees against such actions ?

Mr. Reed—Oh no, I can stand as guarentee for them but are you responsible for every one of the tenants.

আমি—Yes, why not ? I will be responsible for the action of every man and woman here.

ইত্যবসরে প্রজারা হাজারে হাজারে লালপুর থানা অফিস ছাইয়া ফেলেন।

Mr. Reed—বিপুল জনতা দেখিয়া আবারও একবার আমায় জানাইলেন 'you must know my friend Mr Chowdhury we are but puppets under the present constitution. Personally, I am with you to redress the grievances if any—but if I connot get them into any section of penal code then I think you will not make me responsible for any injustice meeted out.'

আমি--Hope that you will send the true report of the enquiry to your honours Govt.

Mr. Reed—Yes, no doubt. Dont worry about it.

প্রজারা Magistrate সাহেবের কাছে আমাকে দেখিয়া সকলে ভিড় করিয়া ডাক বাংলোর সম্মুখের দিকে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল 'সাহেব আমাদের দুঃখের কথা লিখে নিন এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।' অবস্থা দেখিয়া সাহেব অনতিবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। বারান্দায় এক অংশে Mr. Reed তদন্ত আরম্ভ করিলেন, অপর অংশে আমি সেই সাক্ষ্য লইতে আরম্ভ করিলাম। ইহা দেখিয়া Mr.

Reed আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, what are you doing there Chowdhury ?

আমি—I want to take down the statements of the witnesses who are standing before you.

Mr. Reed—What will you do with that ?

আমি—I will send it with a report to my chief Mr C. R. Dass.

Mr. Reed—But I request you not to be present before the witness while I am taking their statements.

আমি—Most gladly. But similarly I may expect a favour from your honour that no one of the 'Saheb Sarkar' will be present during your honour's enquiry.

Mr. Reed—Surely I will look over that.

মিদ্নাপুর জমিদারী কোং বিলমারিয়া কুঠির জেনারেল ম্যানেজার Mogor Yailon এবং অন্য কর্মচারীবৃন্দ শাসক মহোদয়ের বাংলোয় যেতে পারে নি। আমি আসার সময় সাহেবকে অভিবাদন করে নেমে এলাম, তিনি প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন don't mind please ! সহাস্যে তাঁর সৌজন্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাংলোর পিছনে একটা গাছতলায় কাগজ পত্র নিয়ে বসে গেলাম, একে একে সাক্ষীরা উপস্থিত হতে লাগলো বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আমি ও সাহেব উভয়েই সাক্ষ্য নিলাম। সে সুদীর্ঘ তদন্তের সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে লিখে অযথা এই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নাই, সংক্ষেপে জানাই—

রেকাব দল

ঘোড়ার জীনে যে রেকাব আঁটা থাকে সেইটী দল (অর্থাৎ আঁটায়ের চামড়ার পেটি) সমেত জিন হতে কেটে নেওয়া হয়ে থাকে কুঠির সাহেবের আদেশ অমান্যকারীকে বা অপরাধীকে একটা থামের ওপর হাতকড়ায় হাত ও নীচের পা-কড়ায় পা দুটি এঁটে দিয়ে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় পাছায় ও পিঠে ঐ 'রেকাবদল' দ্বারা সজোরে প্রহার করা হয়। এই 'রেকাবদল' প্রহারে যে কত হতভাগ্যের মরণ হয়েছে তার ঠিক নাই। ঐ 'রেকাবদল দর' খেয়ে আজও

যারা বেঁচে আছে, চিরকালের জন্য পাছায় সুগভীর দাগ থেকে গেছে, 'রেকাবদল' প্রভৃত বহু লোক অর্ধ উলঙ্গ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিয়েছে, সাহেব মাত্র কয়েকজনের নাম লিখে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান এবং ঘন ঘন কলম কামড়াতে থাকেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই 'রেকাবদলের' আস্বাদ হতে বঞ্চিত নন, তবে লজ্জায় এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না।

শ্যামচাঁদ

এ একটা বিশেষভাবে বায়না দিয়ে তৈরী করানো জুতো। এই শ্যামচাঁদের দ্বারা অবাধ্যতার জন্য বহুলোককে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ঐসব প্রহারের জন্য স্বতন্ত্র নগদী বা পাইক আছে, কত বিশিষ্ট ভদ্রলোকও যে এর স্বাদ পেয়ে থাকেন, তার প্রমাণও সাহেবের কাছে উপস্থিত হল। অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি প্রমাণ দিচ্ছি। গৌরীপুরের প্রাণকৃষ্ণ সরকারকে গঙ্গাবাজারে ঢোল সহরত দিয়ে বহুলোকের সামনেই ২৫ জুতো মারা হয়েছিল। তার অপরাধ গৌরীপুর বাজারে বাবলা কাঠ কিনেছিল গঙ্গাবাজারে না গিয়ে। সময় সংক্ষেপের জন্য অধিক সাক্ষ্য নেওয়া বন্ধ করে মাত্র ৫।৬ জনের আঘাত চিহ্ন দেখে সাহেব 'ষ্টুপিড' মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

বেগারের জন্য জুলুম ও তার রকম

কুঠি হতে পদ্মা দূরে, সাহেব ও কুঠির আমলাবর্গ কেউ পদ্মা হতে জল আনতে পারেন না, সেজন্য দৈনিক পালাক্রমে এক গাড়ী পদ্মার নির্মল (টিন বা ড্রাম ভর্তি করে) জল দুই বেলাই কুঠিতে বহন করতে হয়। এজন্য মজুরী কেউ পায় না, যদি নিজের অসুস্থতার বা অক্ষমতার জন্য কেউ নিজে আসতে না পারে তবে গাড়ী ভাড়া করে সেই পালা বজায় রাখতে হবে।

রাস্তামেরামত ও পুকুর কাটা

সাহেব নিজে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈরী ও মেরামতির জন্য ঠিকা নিয়ে থাকেন, ঐ কাজের জন্য নামমাত্র মজুরীতে কখনও বা বিনা মজুরিতে বেগার দ্বারা শেষ করে প্রভূত লাভ করে থাকেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই এলাকায় ৪ আনি ৫ আনি ও দিঘাপতিয়া রাজারও

জমিদারী আছে সে সকল জমিদার বা রাজাদের কোন ক্ষমতাই নাই, সাহেব কোং বললেই চলে, কারণ ঐ সব জায়গায় প্রজাদের ধরে এনে জোরসে বেগার খাটানো হয়। যদি কখনও কোন জমিদার আপত্তি জানান বা বাধা দেন তখন ঐ সকল জমিদারদের সম্পত্তি জোর করে দখল করা হয়, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা আরম্ভ করে দিয়ে জমিদারদের অযথা ক্ষতি ও হায়রানি করা হয়। প্রমাণ স্বরূপ তখন তাঁতিবন্দের জমিদারদেরও ব্যাঙ গাড়ীর ভুঁইয়াদের কথা বলা যেতে পারে। যদি কখনও কোন মজুরদের মজুরী সাহেবরা দিয়ে থাকেন তবে তা অন্যান্য গরহাজির কুলীদের জরিমানা করেই দিয়ে থাকেন। পুষ্করিণী কাটার ব্যবস্থা ঐ রকম।

হাঁসমুরগীর ডিম আদায় জুলুম

কুঠির সাহেব প্রভুরা মুরগী ও ডিম খেয়ে থাকেন, এজন্য প্রজাদিগকে বিনা মূল্যে যোগাতে হয়। হয়তো কোথাও কোন লোকের পালা পড়েছে মমতাবশতঃ তার যুবতী স্ত্রী ঐ হাঁসমুরগী বুকে চেপে রেখেছে, দিতে নারাজ, তখন উপস্থিত পেয়াদা বা পাইক জোর করেই যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করেই কেড়ে নিতে কুণ্ঠিত নয়। এ রকম ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক। খাসি বা ভেঁড়ার বাচ্ছা আদায়ের ব্যাপারও ঐ রকম, তবে দৈনিক বরাদ্দ নেই, নধর খাসি বা ভেড়ার মাংস খাবার ইচ্ছা হলেই প্রজাদের কার বাড়ী সেটা আছে খোঁজ নেওয়া হল, এক কথায় না দিলে শ্যামচাঁদ বা বেকারদলের আস্বাদ হতেও বঞ্চিত হয় না; জরিমানাও হয়ে থাকে। বর্তমানে ঐসব এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গা সহা হয়ে গেছে। কাজেই ওজর বা আপত্তি কেউ বড় করে না।

বিলাতি যব ও গমের বেগার

এ অঞ্চলের জমি সবই পদ্মার চরভূমি সে জন্য পয়স্থি ও সিকস্থি বলে একটা আইন আছে। সাহেবের সমস্ত জমিই প্রজাদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট ভাগ ভাগ জোত। জমি হতে ধান উঠে গেলেই ঐ সব জমি সাহেব কোং ঘাস বলে গণ্য হয় এবং ঐ ঘাস জমিতে একটি যে কোন ফসল বেগার তুলে দিতে হয়। বীজ সাহেব সরকার দেয়, যে চাষী যত বিঘা জমি রাখে, সাহেবদের ইচ্ছানুযায়ী (তত বিঘা জমিই) ফসল তৈরী করে সাহেবদের কুঠিজাত করে দিতে হয়, সবই কিন্তু

বেগারে। এই সর্ত বজায় রাখতে পারলে তবে প্রজার জমানুযায়ী জমা বজায় থাকবে নচেৎ কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী সাহেব কোং ঐ জমি খাস করে নিয়ে যাকে খুসী বিলি করতে পারবেন।

এই জমিগুলি কি উপায়ে প্রাপ্ত দেখুন। বড় নদী বা পদ্মার চরভূমি যে কেমন, সেটা স্বচক্ষে না দেখলে অনুমান করতে বিলম্ব হবে। 'চরভূমি' বলতে বিস্তীর্ণ বেলাভূমিকেই বোঝায়। ঐ বেলাভূমি ঝাউগাছে পূর্ণ ঝাউ বনে বন্য বরাহের আড্ডা প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ এই অঞ্চলটায়। এই চরের প্রজারা এদের বাপ পিতামহ ঐ ঝাউ বন কেটে জায়গায় জায়গায় বালি সরিয়ে এই জমি বের করেছেন, বিনিময়ে কয়েকবছর আয়মা (বিনা খাজনায়) খেতে পেয়েছে, তারপর সাহেব সরকার কবুলতি আদায় করে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। খুবই সুবিধে খাজনা লাগে না, ধান অর্ধেক দিলেই হবে। জমির ধান কাটা হলেই জমি সাহেব সরকারের, তবে যদি বেগারে একটি ফসল তুলে দেয়, তবে সরকার জমি কেড়ে নেবে না, বেগারে একটি ফসল তুলে দিলেই স্বর্ত বজায় থাকবে। এ তো খুবই সুবিধা কারণ চরের জমি খুব উর্বর। চরে জমিতে চাষও বেশী দিতে হয় না। সামান্য চাষ দিয়ে বীজ বুনে দিতে পারলেই যথেষ্ট হলো।

সরলপ্রাণ চাষীরা তখন জানতো না যে, কি ভীষণ চাষ করানো হবে। এইভাবে বোকা বুঝিয়ে প্রজাদের কাছ হতে কণ্ট্রাক্ট ভাগ জোতের কবুলিয়তী আদয় করে রক্ষক বেশে ভক্ষক হয়ে উঠেছে। বেগারের ফসলটি জমিদারী কোং এলাকা ভেদে কোথাও বা বিলাতী যবের বা গমের, কোথাও বা নীলের চাষ? বিলাতী যব ও গম বা নীলের জমি কি রকম চাষ ও জমি পাট করে তৈরী করতে হয় তার বিবরণ শুনুন। সে অশিক্ষিত চাষী বীজ বুনে দিলেই কাজ মিটে যাবে মনে করেছিল।

আজ তাদের কি ভাবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাজ করতে হচ্ছে চিন্তা করলেও প্রাণে শিহরণ আনে।

জমি পাশ

ধান উঠে গেলেই নিয়মিত সময়ে জমি চাষ করবার হুকুম হয়ে থাকে, জমি চাষ দেওয়া শেষ হলেই কুঠিতে খবর দিতে হবে 'জমি চাষ হয়েছে দয়া করে সেটা

দেখে যাবার হুকুম হয়।' শ্বেতাঙ্গ প্রভু এক একটি এলাকার জন্য দিনস্থির করে দিয়ে নিজ নিজ জমির নিকট হাজির থাকতে আদেশ দেন, প্রজারা প্রভুর নির্দিষ্ট দিনে নিজ নিজ জমির ধারে হাজির থাকে। সাহেব মহোদয় প্রত্যূষেই ওয়েলারে আরোহণ করে 'জমি পাশ' করতে আসেন। চডের জমি আমাদের পশ্চিম বাংলার মত ছোট্ট ছোট্ট খণ্ডে জমি বিভক্ত নয়। এক একখানি জমি ২৫।৩০ বিঘা করে। জমি পাশ করার 'মাপকাঠি' কি তাহা জেনে রাখুন। চষা জমিতে ওয়েলার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া চাই, যার জমিতে ঐ রূপ পা ডুববে না তার জমি পাশ হবে না। সাহেব মহোদয়কে অযথা হয়রান করার জন্য ও কাজে অবহেলার জন্য শঙ্করমাছের চাবুক দ্বারা ঐ প্রজাকে জর্জরিত হতে হয়।

প্রজারা কম্পিত হৃদয়ে ও কম্পিত কলেবরে নিজ জমির ধারে নিজ নিজ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে থাকে, ঘোড়া যেন জমিতে না দাঁড়ায়, ঘোড়া দাঁড়ানো মানেই তো ঐ চাবুকের ঘায়ে রক্তাক্ত হওয়া। প্রহারের ফলে, অনেকের ২।৩ মাসের 'ঝোল ভাত' ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে যায়, এমন কি কারো বা কাটা ঘা বিষাক্ত হয়ে প্রাণান্ত পর্যন্ত হয়ে থাকে, এই গেল জমি পাশ করার কথা।

ঢিলি পাশ

ঢিলি পাশ এটা আর একটি ব্যাপার, এর অর্থ হচ্ছে এই যে জমি ঠিকমত চাষ বা পাট করার মাপকাঠী নির্ধারণ, তৈরী করা জমিতে কত বড় ঢিল থাকতে পারবে।

এক এক এলাকার—পরামানিকরা একটাকা চারআনা নজরানা দাখিল দিয়ে দিয়ে ঢিলি পাশের দিন ধার্য করে যায় এবং ঐ নির্দিষ্ট দিনে পুনরায় একটাকা চারআনা নজরানা দাখিল করে, সাহেবের নিকট দরবার করলে সাহেব মহোদয়ের নিকট হতে 'ঢিলির' নমুনা পাওয়া যায়, একটি মুখমোটা কাঁচের বোতলে গোল করে ঘষা কতকগুলি ঢিলি রক্ষিত থাকে, সেই গুলি দেখিয়ে পরামানিক দিগকে বুঝাতে থাকেন, 'দেখো শালা লোক ঠিকসে দেখো! ইসসে বড়া ঢিল জমিন মে রহনেসে জান খা লেগা।' ঐ নমুনার ঢিলটি আর একটু বড় করে দেবার জন্য প্রজারা বহু কাঁদাকাটা করে। হয়তো কখনও করুণাময় শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দয়া হয়, নয়তো দূর-দূরান্তর হতে আগত প্রজারা অভুক্ত অবস্থায়

অন্যুক্ত বেলা পর্যন্ত কাঁদাকাটা সার করে বিফল মনোরথ হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে ঐ নমুনার মাপ করা একটি ঢিলি নিয়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘরে ফিরে যায়।

চাষীরা—ছেলে মেয়ে সকলে মিলে ঐ ঢিলির নমুনা মত ঢিলি বা মাটী গুঁড়াতে আরম্ভ করে।

জোতের জমি অনুযায়ী 'বীজ' কুঠি হতে আনতে হবে, অবশ্য বিনামূল্যে, বীজ এনে বাতমাফিক বীজ ছড়ানো হলেই চাষের কাজ শেষ হল বলে গণ্য করা হয়।

ফসল কাটা ও কুঠিজাত করা

কিরূপে প্রজার বাড়ীতে প্রত্যূষেই একটি করে তামার পয়সা দাদন স্বরূপ ফেলা হয় ইতি পূর্বে জানিয়েছি। যে বালকটি ইতিপূর্বে বিলাতী যবের গাছ কেটে প্রস্তুত হয়ে আমার কাছে ধাপাড়ী গিয়েছিল তাকে এবং আরও চার-পাঁচ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে হাজির করা হয়।

বিলমারিয়া কুঠির অধীনে 'নীলের চাষ' বা হাঙ্গামা নাই সে জন্য এ ক্ষেত্রে সে কথা উল্লেখ করলাম না। কেবলমাত্র Mr. Reedকে যা জানাই তাহাই প্রকাশ করছি মাত্র।

সাহেব মহোদয় কুঠিতে মুরগী ও ঘোড়া রাখেন, তাদের খোরাকীর জন্য কতকগুলি জমি বেগারে তুলে দিতে হয়।

খাজনা আদায়

খাজনা বলে প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই, সাহেব সরকারে প্রাপ্য অর্ধেক ফলসই খাজনা বলে আদায় হয়ে থাকে। ঐ অর্ধেক ধানের মূল্য আদায় হয়, ঐ মূল্য নির্ধারণের অদ্ভুত উপায়—একটা এলাকায় যে সমস্ত জমি আছে তাহা সমস্ত মাঠ হিসাবে ভাগ করা হয়। মাঠের যে অংশে সব চাইতে ভাল ফসল হয়েছে, সাহেব কিম্বা নায়েব মশায় বা গোমস্তা পাঠিয়ে; জমিদার কোং প্রাপ্য অর্ধেক ফসল নিলাম করে থাকেন। সাহেবের কয়েকজন ও পেয়ারের কয়েকজন খরিদ্দার ডাক দিতে আরম্ভ করে। মনে করুন একটি দশবিঘা জমির অর্ধেক ধান নিলাম আরম্ভ হল, ডাক যে কেউই দিতে পারে, হয়তো প্রজাদের তরফ হতে আট টাকা দর দিল, যার জমি সে দশ টাকা, ডাক দিল প্রজাপক্ষের কেহ আর ডাক দিল না,

তখন দফাদারদের ইঙ্গিতে সাহেবের পেটাও লোক কেহ বা ১২।১৪ পর্যন্ত ডাক দিল, অমনি করে ত্রিশ, পর্যন্ত উঠলো, ত্রিশ এক বা ত্রিশ দুই পর্যন্ত সাহেব কোং ব্যগ্র, তখন চাষী ভাবে এত কষ্টের ফসল নিয়ে অন্যে লাভ করবে এবং ভাগের সময় গোলমালও হতে পারে, নানা চিন্তা করেই চাষী নিজেই প্রাণের দায়ে আর একবার একত্রিশ ডাক দিল। তখন আবার ডাক চললো, নিলামের একটা মজা আছে, অতি গরীবও নিলাম ডাকের সময় ভুলে যায় যে সে জিদের বশেই ডাক দিচ্ছে। মূর্খ প্রজাদের ভাব-প্রবণতার সুযোগ নিয়েই বা (তার মধ্যে ফেলেই) তার মনে জিদের ভাব জাগরিত করে তার রক্ত শোষণ করার কি সুন্দর ফন্দিই না সুসভ্য ইংরাজের মাথায় জেগেছে, ডাক উঠে গেল শেষ পর্যন্ত চল্লিশ টাকায়।

সাহেব কোং দেখলেন গড়পরতা বিঘা প্রতি চার টাকা খাজনা হয়ে গেল। একজন প্রজা যেমন ঐ ধান কিনলো অমনি সেই মাঠের সকল জমির খাজনাও ঐ হারেই সকলকে দিতে হবে। মনে রাখুন ঐ এলাকায় ঐ নিলামী জমিখানিই সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব সাহেব কোং গাওনার সুর বেঁধে দিলেন 'উদারা' 'মুদারা' ছেড়ে 'তারায়' !! তারপর হাতে ধরা, পায়ে পড়া, আবেদন, নিবেদন সাহেব কোং নিরব নিথর ! যে জমি অতিরিক্ত হাজা বা ডাঙ্গা, সেও জমি থেকেও ঐ হারে খাজনা আদায় হতে লাগলো।

এখানে খাজনা আদায়ের মর্মন্তুদ কাহিনী একই রকম, তবে জেনে রাখুন খাজনা আদায়ের জন্য 'শ্যামচাঁদ' 'রেকাবদল' সবই চলে।

আবুয়াব

খাজনার সঙ্গে যা আদায় হয়, খাজনার বাড়তি আদায়, তাকে আবুয়াব বলে।

তহুরী টাকা প্রতি আট আনা আদায় দিতে হয়।

খুর জ্বালানী—ইহা একটি বাজে আদায়, সাহেব কোং জমির ওপর দিয়ে প্রজাদের গরুমহিষ পশু বিচরণ করে সে কারণ তাদের খুরের পেষনে সাহেব সরকারের জমি বা ডাঙ্গায় কিম্বা চরের ঘাস জ্বলে যায়, তার জন্য সাহেব কোং ক্ষতি হয়, সেজন্য গৃহস্থের পশুর সংখ্যানুপাতে একটা আবুয়াব দিতে হয়। পূর্বে মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদিগকে মাথাপিছু জিজিয়া কর দিতে হতো, বর্তমানে সাহেব কোং এলাকায় ছাগল ভেড়া গরু মহিষের জন্য মাথাপিছু খুর জ্বালানী দিতে হয়।

ডায়নামো খরচ

কুঠিতে 'বৈদ্যুতিক বাতি' জ্বলে, সেজন্য ডায়নামো চালাতে হয়, একজন মেকানিক ও কয়েকজন বয় আছে, বাৎসরিক মেরামতি খরচও আছে, সমস্তই প্রজাদিগকে বহন করতে হয়, কাজেই খাজনার টাকা প্রতি দুই আনা, আবুয়াব দিতে হয়।

অন্নপ্রাশন বিবাহ যৌতুক আদায়

সাহেবের নিজের অথবা কাছারীর বড় দেওয়ান বা নায়েব পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করলে, অন্নপ্রাশন খরচা পদমর্যাদানুযায়ী টাকায় দুই আনা হতে চার আনা পর্যন্ত আদায় হয়ে থাকে। 'মাগন' রূপে অনেক কিছুই আদায় হয়ে থাকে।

গুদীমারা

পদ্মার ধারে চরের উপর যারা বাস করে তাদের অনেকেরই নৌকা আছে, বর্ষার আগেই সেই নৌকাগুলিকে মেরামত করার জন্য নদীর কিনারে তুলে তলদেশ মেরামত করা হয়, সেজন্য নৌকাপিছু 'গুদীমারা' আবুয়াব দিতে হয়।

ফলের জন্য আদায়

যদি প্রজাদের বাস্তুভিটার ওপর কিংবা ভাগ জোত এলাকায় আম, কাঁটাল ইত্যাদি বৃগাছা থাকে তবে প্রজা তাহা ভাগ করতে বাধ্য, ফল পাকলেই কুঠিতে সংবাদ দিতে হবে, কুঠি হতে নগদী বা গোমস্তা এসে দাঁড়ালে ঐ ফল পাড়তে পারবে এবং ঐ ফলের অর্দ্ধেক বা তার মূল্য দিতে হবে তবে প্রজারা তাদের বাপ পিতামহের স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে পারবে। যদি বাড়ীর কোন ছেলেপিলেরা খেয়ালের বশে সংবাদ না পাঠিয়ে গাছের ফল পেড়ে খায় এবং ঐ সংবাদ সরকার বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় তবে জরিমানা দিতেই হবে।

মৎস্যের জন্য আদায়

বন্যার জল জমির ওপর দিয়ে বয়ে যায় (ফসল নষ্ট করে)। তখন পদ্মার জলে জমিগুলি ভর্তি হয়ে যায়, বন্যা কমলে অপেক্ষাকৃত খাল জমিতে অনেক জল

দাঁড়িয়ে যায়, ঐ জলের সঙ্গে অনেক মাছও ঐ জমিতে আটক পড়ে। সাহেব সরকারের বিনা অনুমতিতে প্রজারা একটা মাছও ধরতে পারে না, গোমস্তা হাজির রেখে তবে মাছ ধরতে পারবে এবং অর্দ্ধেক মাছ বা মূল্য দিতে হবে।

সাহেব কোং যেখানে যেখানে জলকর আছে (দামোশ বা পদ্মা) সেখানে মাছ ধরলে, প্রথমতঃ জলকর খাজনা দিতে হয় দ্বিতীয়তঃ নৌকা প্রতি দুই চারটি মাছও আদায় হয়, মাছ বলতে এ অঞ্চলে ইলিশ বা রুই কাতলাই বোঝায়, ঐ সকল মাছ যদি সাহেবদের বাজারে বিক্রয় জন্য নিয়ে যায় তা হলে সেখানেও নৌকাপিছু দুই একটি মাছ 'তোলা' হিসাবে দিতে হয়, বিক্রেতার মাথা পিছু দু'আনা 'দান' দিতে হয়। নৌকায় কতগুলি মাছ আছে সেটা বিবেচ্য নয়। নৌকা মাছ ধরে উঠলেই মাছ আদায় দিতে হবেই।

শিক্ষার ব্যবস্থা

এ বিষয়ে বেশী কিছু না বলে নিম্নলিখিত ঘটনা হতেই এ অঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থা বুঝিতে পারা যাবে।

কয়েকজন প্রজা ও পরামাণিক মিলে 'বাগান বাড়ী' গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পর ঐ সংবাদ পেয়ে সাহেব মহোদয় (Major Tailor) স্বয়ং এসে উপস্থিত হন এবং তদন্ত করে জানতে পারেন যে স্কুল স্থাপিত হওয়ার কথা সত্য। তখন রাগে অধীর হয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন 'টুম, শালা লোক লিখা পড়া করিবে—হামার চাষ কি রকমে হবে? উঠাও স্কুল।' তৎক্ষণাৎ পাঠশালা উঠে গেল। ঘরখানিও জ্বালিয়ে দেওয়া হল ভবিষ্যতে যাতে পুনরায় পাঠশালা না বসতে পারে।

চেক দেবার অদ্ভুত ব্যবস্থা

চেকদাখিল দেখে নেবার ক্ষমতা কারুর নাই—'ওয়াশীল চাল' কর! তহশীলদারের প্রধান ব্যবসা। নিয়মিত চেক কেহই পায় না, অনেক প্রধান বা পরামাণিকও জব্দ-হয়ে আছে ঐ 'ওয়াশীল চলের' ঠেলায়। পরামাণিকরা কোনরূপ বিদ্রোহও করতে পারে না, তা হলে সুদ সমেত বাকী খাজনার 'নালিশ' করে তাকে ভিটেছ ঘুঘুছ করা হয়।

বিচার বিভাগ

মিদনাপুর জমিদারী কোং এই বিচার বিভাগটি 'বৃটিশ গভর্নমেণ্টের' বিচার বিভাগকে নীরব করে রেখেছে। লালপুর থানার নথীপত্র হতে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আগেই জেনে নিয়েছেন যে গত পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে বিশেষ কোন কেস পুলিশ রেকর্ডে নাই। কুঠিতে বেলা আট বাজলেই Major Tailor সাহেব তাঁর বিচার আসনে বসে থাকেন এবং এ এজলাসে খুনী মামলার বিচার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমন দিন নাই যে দিন পাঁচ দশ নং মামলা সাহেব বিচার করেন না। বিচার যাই হক না কেন জরিমানাখাতে জমা বেড়েই যায়, ঠিক যেন সেই বাঁদরের পিঠে ভাগের মত।

খুনী মামলার টাকা আদায় করে খুনকে 'গাপ' করা হয়ে থাকে এর প্রমাণেরও অভাব নাই। লালপুর থানা নিকটেই আছে সত্য, সেখানে সাহেবদের বিরুদ্ধে ডায়েরী করার বা নেবার ক্ষমতা বা সাহস S. I এর নাই। S. I ভদ্রলোক গভর্নমেণ্টের বেতনভুক্ত হলেও সাহেব সরকারেরই হুকুমের তাঁবেদার। মেদিনীপুর জমিদারী কোং হুকুম বহির্ভূত কিছু করা মানেই গরীব ভদ্রলোকের বদলা কিংবা কর্ম হতে বিতাড়িত হওয়া।

এই সময়ে শাসক মহোদয়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো—তিনি আমাকে বললেন 'Well Mr. Chowdhury, have you taken down the depositions ?' আমার হস্তেই লিখিত জবানবন্দীর কাগজগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন 'Oh, I see ! you have got them here. Then what are you going to do with those news' ?

আমি বলিলাম—I will just send these papers to my chief Mr. C. R. Das by registered posts now if it becomes possible for me.

আমি জবানবন্দীর কাগজগুলি একটি বড় প্যাকেটে ভরে গালা সীল করিলাম। Magistrate সাহেব তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বলিলেন 'My dear Chowdhury, I am really convinced of the sufferings & oppressions here. Now I am awfully tired, let me have some rest. Ask your men to go home. I am giving you this assurance that I will try my best to

help you in this matter for an end of this oppression and sufferings of the peasants. But you should always remember that my power is also limited.'

আমি—'Many thanks my friend for your kindness and sympathy for the poor. But one thing more, will you please let me know, when you are going to get me arrested?'

Mr. Reed—'Oh! why shall I arrest you'?

আমি—'As a reward for the friendship' এই কথায় উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। পরে Mr. Reed কিছু বলিলেন—

Regarding that, so far I can say that I am always bound to follow the present administration, and if the administration demands your arrest then I will and I must perform that job for my administration. Be it of an ugly design or be it an unpleasant one to me or in the eyes of others.

এই বলে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করলেন।

অসংখ্য প্রজাদের কোলাহল 'বন্দে মাতরম' 'আল্লাহো আকবর' এবং সোমেশ্বর বাবুর জয়ধ্বনির মধ্যে সেখান হতে বিদায় নিয়ে ধাপাড়ী ফিরে এলাম। ধাপাড়ী এসে পুনরায় প্রবল জ্বরে শয্যা নিলাম। তারপর দিন 'জবানবন্দী' গুলি মাননীয় দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের নাম বরাবর রেজেষ্টারী করে পাঠিয়ে দিলাম।

এই ঘটনার পর হতেই বুঝতে পারলাম 'ধর্মঘট' ব্যতীত অন্য কোন কিছুই করা যাবে না। ধর্মঘট করাবার জন্য বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করতে লাগলাম, সকল চেষ্টাই বিফল হল। শেষে প্রায় হতাশ হয়েই ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, 'জননীর আশীর্বাদ ভিন্ন কৃতকার্য হতে পারবে না' অন্তরে কে যেন বলে উঠলো। জননীর জন্য প্রাণও আকুল হয়ে উঠলো, ঘনশ্যামদাকে জানালাম 'আমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবো ঐ সঙ্গে মাননীয় দাশ মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করে আসবো।'

চার

যেখানেই যাই না কেন, শয়নে স্বপনে রাত্রি দিন ঐ অঞ্চলের অসহায় প্রজাদের করুণ মুখচ্ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, আর সেই সঙ্গে শ্রীভগবানের মোহন বঙ্কিম মূরতিখানি। অন্য কোন চিন্তাই মনের মধ্যে ঠাঁই পায় না বা মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কলকাতা এসে দেখলাম কংগ্রেসকর্মী মহলে এবং যাঁহারা আন্দোলনের খবর রাখেন, তাঁদের সকলের নিকটই আমার কৃষক আন্দোলন ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। যাই হোক অনেক-তৎকালীন সংবাদপত্রেও ঐ সব খবর ছাপা হয়ে থাকে তাও আমি শুনলাম।

বর্ধমান জেলায় আমার বাড়ী, আমি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, বাড়ী পৌঁছে জননীর পদধূলি নিয়ে ধন্য হলাম। তিন দিন মায়ের কাছে থেকে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, মায়ের আদেশ পেলাম না। বহু রকমে মাকে বুঝিয়েও যখন অনুমতি পেলাম না, তখন সকল কথাই মাকে বুঝিয়েও খোলাখুলি জানালাম 'এখন যদি না যাই তবে ঐ গরীব প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার হবে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমা কর্তৃক যদি সেটা হয় তবে ভগবানও আমার সর্বনাশ করবেন, টাকা উপায়ের জন্য তো সবকিছু প্রয়োজন, বলুন জমি কত বিঘা চাই? আমার মুখের কথায় হাজার হাজার বিঘা জমি পেতে পারি এবং আপনাকে তা দিতে পারি। বলুন আমার সম্বন্ধে এখন কি করবেন?'

সন্তানের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় জননী বিচলিত হলেন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে বহু আলাপ আলোচনার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন 'যা ভাল বোঝ তাই কর, তবে আমার একটি মাত্র ছেলে কেউ যদি মেরে ফেলে সেই ভয়। বিষয়-আশয় কিছুই চাই না, লোভও নেই ওসবে, যা আছে তাই যথেষ্ট।'

মাকে বললাম, মনে দ্বিধা রেখে অনুমতি দিলে হবে না, আমি ভগবানের আদেশেই আপনার কাছে অনুমতি নিতে এসেছি। আপনি মন খুলে মুক্তকণ্ঠে আমাকে বিদায় দিতে না পারলে আমার কোন কাজই সফল হবে না।

রাত্রে দু-বার ঘুম ভেঙ্গেছিল, দুবারই দেখলাম, জননীর নিদ্রাহীন চক্ষে ঘুম নাই শুধু নিঃশব্দে পড়ে আছেন। আমিও আর ঘুমাতে পারি নাই। আমার স্ত্রীর কাছ হতেও মৃদু প্রতিবাদ এসেছিল, তিনি স্বল্পভাষিণী এবং আমার কোন কাজেই কখনও বাধার সৃষ্টি করেন নাই। যদিও মুখে পুনরায় কোন কথা

বলেন নাই। তবুও তাঁর মুখচ্ছবি দেখে তাঁর অন্তরের বেদনার্ত ভাব অজ্ঞাত রইল না। তিনি সকরুণ হাসি মুখেই বিদায় দিলেন।

ভোরে মা আমায় বললেন 'তুমি না গেলে যদি এতগুলি লোকের ক্ষতি হয়ে যায় তবে যাওয়াই উচিত!!' আমি শয্যাত্যাগ করেই মায়ের চরণ চুম্বন করলাম, জননী প্রাণ খুলেই আশীর্বাদ করলেন। সকালবেলা যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখে মা বললেন 'আজ সারাদিন রাত্রি গতে আগামী ভোরে রওনা হবে।'

পরদিন ভোরে যাত্রাকালে মায়ের পদধুলি মাথায় নিলাম। মা আশিষ বাণী উচ্চারণ করলেন 'যে কাজে যাচ্ছো সে কাজে সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হবে, তোমার মুখের কথাই বেদবাক্য বলে সবাই গ্রহণ করবে। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিও।'

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। মাও হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলেন। বাড়ীর সামনেই ৺ক্ষেপাকালী মায়ের বেদী, তার ডাইনে শ্যামসুন্দরের দোলমঞ্চ, বামে মহাদেবের ভগ্ন দেউল, ও রক্ষাকালী মায়ের বেদী। একে একে সব ঠাঁই প্রণাম করলাম মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। পুনরায় মায়ের চরণ চুম্বন করে গোযানে উঠে বসলাম। অন্তরালবর্তিনীর মিনতি ভরা দুটি চক্ষুও একবার নয়নসম্মুখে ভেসে উঠলো। প্রায় ৫।৭ মিনিট জননী গোযানের পাশে পাশেই হেঁটে চললেন, অনেক কষ্টে তাঁকে বাড়ীমুখী হতে দেখলাম। গাড়ী গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠলো। আমার মনে তখন অসংখ্য নিরীহ প্রজাদের মুখ ও অন্য দিকে জননী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি নির্বাকভাবে গো-গাড়ীতে বসে রইলাম। আট ঘণ্টা গোযানে এসে তবে 'মেমারী' স্টেশনে আমার ট্রেন।

কলকাতায় এসে ১৭ নং ভীম ঘোষ লেনে শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় দেখলাম 'মফঃস্বল সংস্করণ বসুমতীতে' আমার আন্দোলন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সঙ্ঘের অফিসে উপস্থিত হলাম। উদ্দেশ্য দাশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করা।

সেখানে শুনলাম তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন। আর বিলম্ব না করেই শিয়ালদহে সাড়ে চারটায় দার্জিলিং মেলে উঠলাম। ঈশ্বরদি পৌঁছলাম রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ। বিলাসবাবুর আড়তে রাত্রি কাটিয়ে সকালেই আমি ধাপাড়ী রওনা হলাম।

ধাপাড়ী পৌঁছে সংবাদ পেলাম যে নাটোর পুলিশ অফিসে কে একজন বন্ধু আছে, তিনি সংবাদ দিয়েছেন তাহেরপুরের জমিদার বাড়ীতে একটা শিকার পার্টি জমায়েত হয়েছে আজ তিন দিন। সেই পার্টিতে আছেন রাজশাহী জেলাশাসক Mr. R. N. Raisd. বিলমারিয়া কুঠির ম্যানেজার সাহেব, নাটোরের D. S. P. এবং আরও অনেক পুলিশ কর্মচারী। এই পার্টির উদ্দেশ্য সোমেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা না করা বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করা। মেজর Tailor কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে গ্রেপ্তার করাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু জেলাশাসক মহোদয় বলেছেন 'হঠাৎ সোমেশ্বরকে গ্রেপ্তার করলে যদি সোমেশ্বরের স্থলে সি, আর, দাস এসে উপস্থিত হন, তাহলে এ আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করবে। এ কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে একমাত্র মিঃ দাশই জানেন এবং তিনিই সোমেশ্বরকে পাঠিয়েছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন সম্বন্ধই নাই; তবে সোমেশ্বর নিজে কংগ্রেসকর্মী, এ অবস্থায় এখনি গ্রেপ্তার না করাই ভাল। তার উপর এখনও 'ধর্মঘট' বা কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ হয় নাই যে এখনি তাকে গ্রেপ্তার করার আইনতঃ কোন কারণ উপস্থিত হয়েছে, গ্রেপ্তার এখন স্থগিত থাকুক।

মোট কথা আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা না করলেও সাহেব কোং চেষ্টা করছেন।

যত সত্বর হয় আপনি কাজ সমাধা করার চেষ্টা করুন। এই সংবাদে অনেকটা চিন্তিত হলাম 'কি করা যায়?' প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠলো ধর্মঘট করাবার জন্য। তখনি লোক পাঠিয়ে নরমুদ্দিন সরকার ও জাফরদ্দিন ভাইকে, সিরাজ সরকার আব্দুল করিম দাদা ও ধরম চাঁদবাবু, রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কেদার হালদার, তরণী হালদার, ঘনশ্যাম বাবু ও তারাচাঁদ বাবু প্রমুখ কয়েক জন বাছা বাছা ভদ্রলোক ডাকিয়ে পাঠালাম, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন যে যেমন আছেন সেই অবস্থায় এখনি ধাপাড়ীতে বাজুবাবুর পোড়ো বাড়ীতে কাঁটালতলায় উপস্থিত হন। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সকলে এসে জমায়েত হলেন, পূর্বেই তাহেরপুরের সংবাদ অনেকেই জেনেছিলেন। বাকীটুকু আমার মুখে শুনেই সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমি সকলকে ডেকে বললাম এখন আর একটি মুহূর্ত সময় নষ্ট করার মত উপায় আমাদের নাই। হয় এখন না হয়তো আর কখনও হবে না। এই আমাদের কর্মের বর্তমান অবস্থা, আমাকে বেশীদিন

আর গভর্ণমেণ্ট কাজ করতে দেবেন না এটা সুনিশ্চিত। আজ সকলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুণ যে, "আমরা প্রাণপণে ধর্মঘট আরম্ভর ব্যবস্থা করবো, যতদিন না কৃতকার্য হই, ধর্মঘট হতে ক্ষান্ত হব না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে জীবন পণেও ধর্মঘট চালিয়ে যাবো।"

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, কাল বিলম্ব না করে সকলে চারিদিকে ছুটে চললেন ধর্মঘট করণের প্রারম্ভিক কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য। জাফর ও নয়মুদ্দিন দা আমার সঙ্গেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করেই গাঁয়ে গাঁয়ে পথে পথে প্রজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এঁদের মত সহকর্মী না পেলে আমি কখনই এত শীঘ্র সফলকাম হতে পারতাম না। কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়লো কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। মন ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। প্রজারা এখনও পূর্ববৎ স্নেহ ও গুরুর মত মান্য করে, কিন্তু বহুকালাগত সাহেবদের অত্যাচারের ভীতি, প্রজাদের 'প্রাণ দেবতাকে' পর্যন্ত পঙ্গু করে দিয়েছে। তাদের স্বাধীন মত বা সত্তা ও চিন্তা কিছু নাই! যা আছে তাহা কেবল ঐ সাহেবদের অত্যাচারের ভয়। তাদের সত্তা, চিন্তা বা ধারণা যা কিছু তার সকলি উপ্ত হয় ঐ কুঠির কয়খানি দেওয়ালের মধ্যে। ঐ কুঠিয়ালদের হুকুমের বাইরে অন্য কারুর হুকুম দেবার ক্ষমতা বা অধিকার আছে, তাহা তাদের ধারণার অতীত! কুঠির হুকুম বুঝি দেবতাদের হুকুমের উপরে!

শত চেষ্টাতেও তাদের 'স্বাধীন সত্তার' উপলব্ধি ফেরাতে পারলাম না। গতানুগতিকের গড্ডালিকা প্রবাহে তারা তাদের জীবন তরণী ভাসিয়ে চলেছে, জানে শুধু কুঠিয়ালদের হুকুম তামিল করতে, উজানে বহার দুঃসাহসের ধৃষ্টতা তারা রাখে না, গুরু তো কোন ছার স্বয়ং ভগবানের আদেশ হলেও তারা নারাজ! কাজেই আমাদের সামান্য কয়েকজনের চেষ্টায় আর কি হবে? এই তো সকল চেষ্টার ফল! মনের মধ্যে জননীর আশীর্বাণী আমাকে সকল প্রকার অবসাদের হাত হতে বাঁচিয়ে রেখেছে, নিয়তই কে যেন মনের মাঝে বলছে 'কোন ভয় নাই, চিন্তা নাই, জয়যুক্ত হবেই।' মনের মধ্যে অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্তিখানিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

তাঁহাকে ও জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে, দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করতাম আমার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই 'চাষাদের' কাণ্ড দেখে হাল ছেড়ে দিতে চাইছেন, কোন দিকেই তাঁদের আর উৎসাহ দেখতে পাই না।

পরিশ্রান্ত দেহে উপস্থিত হলাম 'বাথানবাড়ী' গ্রামে উল্‌ফৎ পরামাণিকের বাড়ীতে, রাত্রি তখন ১২টা, খান্‌কায় বসে ঐ কথারই জল্পনা কল্পনা চলছে, আমাকে পেয়ে আলোচনা প্রবল হয়ে উঠ্‌লো, শুনলাম হোসেনী-দা ও নিমতলীর বড় পরামাণিক সে রাত্রে ঘরোয়া আলোচনার জন্য এই বাথানবাড়ীতেই এখনও রয়েছেন। বৃদ্ধ আমানত পরামাণিকের খুবই অমত ধর্মঘট বিষয়ে, তার সঙ্গে আলোচনা ও মীমাংসার জন্যই আমানত পরামাণিকের বাড়ী গেছেন। উল্‌ফৎ লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিতে যাচ্ছিল, আমি বারণ করলাম "না চল, আমরাই সকলে আমানতদার খানকায় যাই।"

আমরা গিয়ে দেখলাম, তখন পর্যন্ত আমানতকে তাঁরা স্ব-মতে আনতে পারেন নি। আমাকে দেখে সকলে খুবই খুশী হলেন। আমি সকলকে করজোড়ে অনুরোধ করলাম "আর বুঝাবার ক্ষমতা নাই বা বুদ্ধিও নাই. সব হারিয়েছি এখন, এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছেই আজ গলবস্ত্রে প্রার্থনা করছি যে আমাকে বিশ্বাস করে ধর্মঘটে যোগদান করুন। ফলাফল খোদার উপর ছেড়ে দিয়ে অটল অচল ভাবে ধর্মঘটকে সফল করার চেষ্টা করুন"।

সকলে নির্বাক ও নিশ্চল! কাঠের পুতুলের মত বসে রইলেন। তাদের রকম দেখে আমি মর্মাহত হয়ে বলে উঠ্‌লাম "ছেড়ে দাও আমানত পরামানিককে, এক আমানত পরামানিককে বাদ দিয়ে কি অন্য কোন মানুষ নাই, যে মুক্ত কণ্ঠে এই ব্রত গ্রহণের কথা স্বীকার করতে পারে?"

সামনে যে সব পরামানিক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম ধরে ধরে ডাক দিলাম—"কুদরৎ পরামানিক! নিমতলীর পরামানিক, হোসেনীদা—! আজ আর কাউকে ছাড়বো না, আজ সকলকেই আমার সঙ্গে পদ্মার জলে ডুবে মরতে হবে, সকলে রাজী আছো কিনা শুনতে চাই"।

শ্রীভগবানের কৃপায় সকলেই সমস্বরে উত্তর দিল "এখনি রাজী"। বললাম "তবে প্রস্তুত হও! ধর্মঘট করতেই হবে, আমি সব সময়ে তোমাদের পাশেই থাকবো, কোথাও ফেলে পালাবো না।" আমি আর কিছু বলতে পারলাম না— বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, চোখে জল এসে গেল। আমার চোখে জল দেখে সকলেই বিচলিত ভাবে অনুরোধ করলেন—"আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, কেবলমাত্র আগামীকাল একটি দিনের জন্য আপনি অপেক্ষা করুন। আগামী রাত্রে আপনাকে শেষ মতামত জানাবো।"

অতঃপর সেদিন রাত্রে আলোচনা বন্ধ হল, উল্‌ফৎ পরামানিকের থানকায় বাকী রাত্রিটা কাটালাম। কয়েকদিন হতেই উদরে অন্ন নেই, দুধই প্রধান আহার, তবে চিঁড়া গুড় মিলতো মাঝে মাঝে। আজ রাত্রেও তাই মিললো।

রাত্রে উল্‌ফৎকে জানালাম "আজ কয়দিন ভাত খাই নি, আগামীকাল আমার কোন কাজ নেই, দুপুরে আমার রান্নার যোগাড় করে দিও। গরুর গোয়ালে একটা ইঁটের উনান ও একটা মাটির হাঁড়ি ও একটা কলসী হলেই চলবে।

সকালে হাতমুখ ধুয়ে থানকায় দাওয়ায় বসে আছি, চারিদিক হতে দৈনিক কর্মের তাগিদ এলো। প্রজার দোরে দোরে নিয়মিত পয়সা পড়ল এবং নরনারীর দল কাজের জন্য চলে গেল। আমি নীরব দর্শকের ভূমিকায় তাই দেখতে লাগলাম, যারা আমার দেখা পেলো, তারা সেলাম দিয়ে জানালো যেন এই অত্যাচার শীঘ্র নিবারিত হয়। আমি সেলাম দিয়ে সকলকে জানালাম "এ কাজ তো আমার হাতে নেই, তোমাদের নিজেদেরই হাতে! খোদাকে জানাও তিনি যেন তোমাদের অত্যাচারের হাত হতে মুক্তি দেন।"

বেলা ৯টা বাজতে না বাজতেই পদ্মায় স্নান সেরে রান্নার জন্য প্রস্তুত হয়ে চললাম। যখন গোয়ালঘরের দিকে চাইলাম, দেখলাম উল্‌ফৎ ভাই আমায় ডাকছে। গোয়ালের দোরে গিয়ে দেখি, একপিঠ ভিজা চুল ছড়িয়ে সদ্যস্নাতা একটি মাতৃমূর্তি নূতন হাঁড়িতে ভাত রাঁধায় ব্যাপৃতা রয়েছেন। একটু পাশে গিয়ে ঐ মাতৃমূর্তি আমায় জানালেন "আমি পদ্মায় স্নান করে নতুন হাঁড়িতে আপনার জন্য রাঁধছি, এই গরীব মায়ের হাতের রান্না খেতে ছেলের বোধহয় আপত্তি হবে না। আমার ছেলেকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবার জন্য আমি সকাল থেকেই যোগাড় করেছি, ছেলের মুখেই শুনতে চাই, এই মায়ের রান্না খাবেন কিনা।"

কিছুক্ষণের জন্য আমি নির্বাক্ হয়ে গেলাম, একদিকে আমার জন্মগত সংস্কার এবং অন্য দিকে মাতৃসমা নারীর আকুল আগ্রহ! (জানিনা কি উত্তর তখন দিয়েছিলাম) তবে নিঃশব্দে যন্ত্র-চালিতের মত পুনরায় সেই থানকার দাওয়ায় এসে বসলাম।

যথা সময়ে কিন্তু সেই মায়ের রান্নাই খেলাম। একটা সামান্য মাত্র সংস্কার আমাকে দৃঢ়ভাবে ঘিরেছিল, আজ এই মায়ের কৃপায় আমার কাছ হতে

চিরদিনের মত বিদায় নিল। দুপুরে বিশ্রামে মনে খুবই আনন্দ পেলাম, মধ্যাহ্নে ভোজনের পর বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, জেগে দেখলাম গতরাত্রের পরামানিকগণ ও আরও অনেকে অঙ্গনে তর্ক আরম্ভ করেছেন। আমাকে জাগ্রত দেখে সকলেই অভিবাদন করলেন, আমিও প্রত্যভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলাম, "সভা কখন হবে?" সকলে উত্তর দিলেন "সভা কিছু হবে না, গত রাতের মত আলোচনাতেই কাজ মিটবে। দূর গ্রামের সব পরামানিকদের মতামত জানার জন্য গোপনে লোক পাঠিয়েছি, তারা সন্ধ্যায় ফিরে আসবে।" সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর লোক এসে সংবাদ দিল "অধিকাংশেরই অমত।"

যাই হোক পুনরায় রাত্রে আলোচনা আরম্ভ হলো, রাত্রি দেড়টার সময়ে জানালো—কুঠি হতে দূরে কোন মৌজায় মাত্র একদিনের জন্য, কেবল আমার অনুরোধ ও সম্মান রক্ষার্থে তারা ধর্মঘট করবে, ২৪ ঘণ্টা শেষ হলেই ধর্মঘটও শেষ হবে। বহু জল্পনা কল্পনার পর 'পর্বতের মূষিক প্রসবের' মত এই সিদ্ধান্ত আমাকে যুগপৎ স্তম্ভিত ও হতাশ করে দিল। ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট করা না করা সমান কথা; ধর্মঘটের সময় আমায় সেই গ্রামে উপস্থিত থাকতে হবে, তবেই তারা ধর্মঘট করবে নচেৎ নয়।

অনেক বুঝিয়েও কোন ফল হল না, বড়ই হতাশ ভাবে ভাবতে লাগলাম। নয়মুদ্দিন দাদাও বহুরকমে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করে কিছু করতে পারলেন না। মনে মনে শুধু ভগবান্‌কে একান্তভাবে ডাকছি, দৈবাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলে ফেললাম "আচ্ছা তাই হোক! তবে দূর মৌজায় করলে চলবে না, কুঠির বুকের তোপের মুখের ওপর এই 'বাথান বাড়ী' গ্রামেই ধর্মঘট আরম্ভ করতে হবে।"

অনেক কলরবের পর তাই ঠিক হল, আমি বাথান বাড়ীতেই রইলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে 'বন্দেমাতরম্,' 'আল্লা হো আকবরা,' 'সোমেশ্বরবাবুর জয়' বিঘোষিত হল। জননীর আশীর্বাদ সম্বল করে একটা দিনের জন্য একখানি গাঁয়েই ধর্মঘট আরম্ভ করতে প্রস্তুত! সহায় শুধু শ্রীভগবান্! চক্রীর চক্র কে বুঝবে? তাঁর মোহন মূরতি চিন্তা করতে করতে অন্তরে অপার আনন্দ পেলাম। সে কি উন্মাদনা। কি আনন্দ উৎসব! সমস্ত রাত্রি কারোর চোখে ঘুম নেই। সব গৃহস্থকে দোরে দোরে শিক্ষা দেওয়া হল কি করতে হবে। প্রধান কথা, কেউই সাহেবের কাজ করবে না, খুন করলেও না, কংগ্রেসের এই আদেশ

দেশের দশের ও ধর্মের এই আদেশ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেন এই আদেশ মেনে চলেন, ২৪ ঘণ্টার জন্য, তারপর কাজ চলবে, যেমন চলছিল।

ভোর হতে না হতেই যথারীতি ঘোড়ায় চড়ে নগ্দী এসে পয়সা ফেলতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত গ্রাম খানি যেন ব্যঙ্গ ভরেই হেসে উঠলো, যেখানে নগ্দী যায় যেখানেই ওই হাসি। পরামানিকরা নগ্দীকে ডেকে বললো "ও হে! আজ তুমি সাহেবকে বলগে, আমরা আজ কেউই কাজে যাবো না, সোমেশ্বর বাবুর হুকুমে আজ কাজ বন্ধ, পয়সা উঠিয়ে নিয়ে যাও।"

পদ্মার তীরবর্তী স্থানেই আমি বসে ছিলাম, নগ্দী এসে আমার কাছে কথাটা সত্য কিনা জেনে নিল এবং সংবাদ সত্য জেনে ঘোড়া ছুটিয়ে কুঠিতে ফিরলো। এই প্রথম 'ধর্মঘট' দেখার জন্য সে কি এক অভিনব দৃশ্য—বাথান বাড়ী ও বিলমারিয়ার চতুর্দিকে! যেন একটা মহাযুদ্ধের সূচনা। কতদূর দূরান্তর হতে ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে চলে লোকসব ছুটে আসছে, পদ্মার ওপর নৌকায় ডিঙ্গিতে পানসী বেয়ে 'বাথানবাড়ী' ঘাটে এসে সব জুটছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এখন এই দীর্ঘদিন পরে সেসব স্বপ্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু সে স্বপ্ন নয়। নিগ্রো কৃতদাসগণের মুক্তি আন্দোলন স্বচক্ষে দেখি নি। বোধহয় সে আন্দোলনেও এত দূর উন্মাদনার সৃষ্টি করে নি। এ যেন ভগবানেরই ইঙ্গিতে অত্যাচারিত জনগণ চলেছে। আমার মত সামান্য এক জনকে কলার ভেলাকে আশ্রয় করে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে তুচ্ছ করে উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিনা, তারই পরীক্ষা।

চতুর্দিকে জনগণ লক্ষ্য করছে ধর্মের জয় হয় কিনা? দেখতে দেখতে ষাটটি ওয়েলার ষাটটি পাইক ও নগ্দী রাইফেল হাতে, এবং অন্য একটি বৃহৎ ওয়েলারে চড়ে স্বয়ং Major Tailor কটীবন্ধে 'রিভলবার' এঁটে এসে সদর্পে উপস্থিত হলেন।

আরম্ভ হল অসভ্য চাষাদিগকে মাঠে পাঠাবার বলপূর্বক চেষ্টা, চড় কিল, লাথি, ঘুঁসী, টানা-হেঁচড়া কিছু বাকী রইল না। মুহুর্মুহুঃ সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো "খুন করলেও যাবো না, গায়ের চামড়া খুলে নিলেও যাবো না, কাজে আজ যাবো না, সোমেশ্বরবাবুর হুকুম"।

সকল রকম চেষ্টা করেও যখন কোন ফল হল না, তখন সদলবলে আমার কাছে এসে গাল দিতে লাগলেন (কুঠির সাহেব বাংলা ভালই বলতে পারেন)

শালা! টোমাকে আমি খুন করবে, শালা টুমি কোটাকার'কে আছো? আমার জমিদারিতে আসচো 'Strike' করতে শালা! খুন করবে ইত্যাদি বহু মধুর সম্ভাষণ। সাহেবের তৎকালীন মুখভঙ্গি উপভোগ করার মত জিনিস। আমারও রাগ হচ্ছিল কিন্তু ধর্মঘটের এই দৃঢ়তা লক্ষ্য করে অন্তরে বিপুল আনন্দ অনুভব করলাম। আমি সাহেবকে 'গুড্‌মর্ণিং' জানিয়ে বললাম "খুন করার চেষ্টা তো আগেই করেছিলে—কর নি কেন? আচ্ছা, হুকুম দিয়েই দেখ না কার মাথাটা ভাঙ্গে। তোমার চারদিকে সবাই আমার ভাই, আমার গায়ে হাত না দিয়ে নিজ মান নিয়ে কুঠিতে ফিরে যাও। আজ আর কেউ কাজে যাবে না, কাজ করবে না, কাল সকালে পয়সা ফেলে দিয়ো, কাল কাজে যাবে।"

কাঠের পুতুলের মত সাহেব তাঁর চারিদিকের, শ্বাসরুদ্ধ প্রায় উৎকন্টিত জনসমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে অজস্র গাল দিতে দিতে কুঠিতে ফিরে গেলেন।

চারিদিকে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, ভেরী বেজে উঠলো, হাজার হাজার কণ্ঠে 'কংগ্রেসকি জয়', 'আল্লাহো আকবর', 'বন্দে মাতরম্,' 'মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়', 'হিন্দু মুসলমানকি জয়' রবে দিগমণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠলো। চারিদিকে ঘোড়ায় চড়ে প্রচারকরাও ছুটে গেল। কোথাও বা গান, কোথাও বা লাঠি খেলা, কোথাও বা অত্যাচারিতগণকে মাল্যদান, সে এক অভিনব দৃশ্য! হোসেনীদা আমায় কাঁধে তুলে সানন্দে নাচতে লাগলেন এবং সমবেত জনতার সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। দুইহাত জোড় করে সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালাম, হোসেনীদার কাঁধে চেপে বসেই।

বেলা ৮টা না বাজতেই 'অত্যাচার রাক্ষসী' দেশ ছেড়ে পালালো, আজিকার সূর্য যেন সহস্র কিরণ বিস্তার করে হাসতে লাগলেন। আমার অন্তরে গোপীমনোহর বংশী বদনের বংশীরব আমায় যেন তন্ময় করে তুলছিল, আমি তাঁর উদ্দেশ্যে ও জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

চারদিক হতেই ঘোড়ায় চড়ে লোক এসে সংবাদ দিতে লাগলো 'অমুক মৌজা ধর্ম্মঘটে যোগ দিল, 'অমুক মৌজা যোগ দিয়েছে' ইত্যাদি—বেলা ১টার মধ্যে মেদিনীপুর জমিদারী কোং, রাজসাহী ও পাবনার সদরের এলাকস্থ সকল মৌজাই ধর্ম্মঘটে যোগদান করলো, সমস্ত দিন আনন্দের মধ্যেই কাটলো।

এক অনাস্বাদিত অমৃতের স্রোতে যেন শোক, দুঃখ, ভয় সবই ধুয়ে গেছে।

সকলকে এক দিনেই সহনীয় ও দুর্দম করে দিয়েছে। পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে সবাই বললে "আর এ জীবনে বেগার দিতে যাবো না, যখন অন্ধ ছিলাম তখন গরু ভেড়ার মত সবকাজই করেছি, আজ একদিনেই চোখ খুলে গেছে, প্রাণান্তেও বেগার দিতে যাবো না।"

ধর্ম্মঘট চলা কালীন বেলা প্রায় এগারোটা আন্দাজ, কতকগুলি প্রজা দলবদ্ধভাবে, কোদাল কুড়ুল ও সাবল গাইতি পিঠে নিয়ে হাজির। কি সংবাদ জানতে চাইলাম, উত্তর দিলে—সাহেব ও তার কর্মচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ আজ নিতে চায়, আমার হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

মনে মনে প্রমাদ গণলাম, প্রকাশ্যে বললাম "এরকম রহস্যের মানে কি? সত্যিই যদি আমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকো, তবে শোন, এ মতলব ছাড়ো, এতে সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হবে, এখনি সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে কতজনের বক্ষ-ভেদ করবে, কারণ বন্দুক হাতে নিয়ে কেউ চুপ্ করে থাকবে না। তোমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে প্রতিপক্ষের গলা কাটতে চাইবে, উভয় পক্ষেই বহু হতাহত হবে, এবং সেই খুনের দায়ী হবো আমি এবং এই খুনের দায়ে প্রথম ফাঁসী হবে আমার, তোমরা সবাই-ও বাদ যাবে না। তবে যদি আমার একার জীবন দানে তোমাদের অত্যাচার নিবারণ হতো, তাতে আমি জীবন দিতে কুন্ঠিত হতাম না —কিন্তু তা না হয়ে অত্যাচার শতগুণ যে বাড়বে। এখন তো সাহেব কোং একলা অত্যাচার করছে কিন্তু তখন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য-সামন্ত এনে অত্যাচার আরম্ভ করবে, তোমরা কি সে অত্যাচার সহ্য করতে পারবে? সবে মাত্র তোমাদের চোখ খুলেছে, এখনও ভালভাবে দেখতে শেখো নি। যদিও আমাদের লক্ষ্য 'বৃটিশ সিংহের' অত্যাচার সহ্য করার মত তোমাদিগকে মানুষ করা কিন্তু সে জিনিস এখনও অনেক দূরে। আমি অনুরোধ করছি তোমরা ক্ষান্ত হও, ফিরে যাও।" আমার অনুরোধ বিফলপ্রায় দেখেই হোসেনী দাদা গর্জন করে উঠ্লেন, বললেন "যাঁর জন্য তোমাদের হাত-পায়ের বাঁধন মুক্ত হলো—তোমরা এমনি নিমক হারাম যে তাঁকেই ফাঁসীতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না। যাও দেখি সোমেশ্বরের বিনা হুকুমে, এত ভাল কথায় থামে না চাষার সুর, এখনি সকলে ঘরে ফিরে যাও, অন্যথায় আমার হাতে আজ কারো নিস্তার নেই।"

হোসেনীদার অসীম সাহস ও অমিত বিক্রমের কথা জানতাম কিন্তু হোসেনীদা যে এমন মস্তবড় খেলোয়াড় তা জানতাম না। দলের মধ্যে হোসেনীদার বহু

শিষ্য ছিল, তারা সকলে নীরব। আমি বললাম "যদি তোমরা কুঠি লুঠ করতে যাও তবে হোসেনীদা ও আমি কুঠি রক্ষা করতে বাধ্য হবো। প্রসন্নর জননীকে মা বলেছি, মাকে বিপদে ফেলে, ছেলে কি চুপ্ থাকতে পারে!"

যাই হোক উত্তেজিত জনতা শান্ত হয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। মেথর, বাবুর্চি, ঘেসেরা, সহিস ও জলবাহক এই সব লোকও প্রজাদের মধ্যেই আছে, সকলকে অহিংস ভাবে নিরুপদ্রব থাকতে বললাম, ধর্মঘট চব্বিশ ঘণ্টার জন্য করা হয়েছিল, সেজন্য রাত্রি প্রভাতের পরই ধর্মঘট বন্ধ রাখতে বললাম। সহিস, মেথর, বাবুর্চি, খানসামা প্রভৃতিকে একে একে সব কুঠি হতে বরখাস্ত করা হতে লাগলো। মীমাংসার জন্য সাহেবদের কাছে প্রধান ও পরামানিকদিগকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম কিন্তু কিছু হল না। ধর্মঘট চালিয়ে যাবার আদেশ দিলাম। ছোট ছোট সভা করতে লাগলাম। সকলকে অহিংস ও নিরুপদ্রব থাকতে অনুরোধও জানালাম।

এই সময় রিফাইতপুর ও সাহেবদের নদীয়া এলাকায় আমার ডাক এলো। পদ্মার অপর পারেই নদীয়ার এলাকা। আলেক মোল্লা ও ভুমির পণ্ডিত এসে একবার ও অঞ্চলে যেতে বললো, এও জানালো যে এখানকার সব খবর ওখানে পৌঁছেছে। ঐ দিকের সমস্ত অঞ্চলই ঠিক হয়ে আছে, কেবল আমি গিয়ে একবার ডাক দিলেই সকলে ধর্মঘটে যোগ দেবে।

তার পরদিনই এই অঞ্চলে হরতাল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—প্রায় বিশ হাজার হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে এক বিরাট 'শোভাযাত্রা' বার করেন। আজও এই দীর্ঘদিন পরে ঐ অঞ্চলের লোকের মুখে আনন্দের সঙ্গে কীর্তিত হয়ে থাকে—গান্ধীজীর দোহাই দিয়া ৪।৫ বাজার উঠিয়ে দিয়ে তৎপরিবর্তে গান্ধীবাজার স্থাপিত করে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই হালদারদের একটি সভা করার জন্য রাজেন চক্রবর্তী মহাশয় ও কেদার হালদারের উপর ভার দিয়েই আমি নদীয়া যাত্রা করলাম।

নদীয়া এসে ভেড়ামারাতেই প্রথম সভা করলাম, সাহেব কোং প্রজাদের ধর্মঘটে যোগ দিতে বললাম। আমার আহ্বানের অপেক্ষাতেই তাঁরা ছিলেন। সেখান হতে হলুদবাড়ী গিয়ে একটি সভা করি, সভার উদ্দেশ্য 'ধর্মঘটে' যোগদান করা। রিফাইতপুরে ইন্দু সরকারের বাড়ী গেলাম। রাত্রে ইন্দুর মুখে শুনলাম—

"কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এসেছেন, জমিদার সুরেন্দ্রনাথ আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন। তিনি সভা আহ্বান করে সকলকেই জানাচ্ছেন 'কৃষক আন্দোলন' কংগ্রেস সমর্থিত নয়, কার্যও নয়, কেউ যেন এতে যোগ না দেয়।"

আমি ইন্দুকে জানালাম "বিজয়বাবু ঠিক কথাই বলেছেন, পরে পশ্চাতে বিজয়বাবুর সঙ্গেও দেখা করবো, বর্তমানে তোমার কাজ কতদূর হল?" ইন্দুর কাছে জানলাম—'সুরেন্দ্রনাথ যোয়ারদার ও বছির মালতে প্রভৃতি ইন্দুর অবাধ্যতা করছে এবং তারা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে। আমি তখনি লক্ষ্মী-খোলা গিয়ে ছোট মত সভা করে ইন্দুর সেনাপতি পদ কায়েমী করলাম। ইন্দুর নষ্ট চরিত্র আমার জানা ছিল, নেশাও সে করে কিন্তু তার মত একনিষ্ঠ সেবক পাওয়াও দুর্লভ, তাই তার পানদোষ ও অতীত চরিত্র হীনতার কথাকে তুচ্ছ করতাম। হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য তার মধ্যে ছিল, তবে আমার সামনে কোনদিন তা প্রকাশ হতে দেখি নি। সে যে একনিষ্ঠ সৈনিক, এটা স্বীকার করতেই হতো।

শ্রীভগবান্ যেন আমাকে সাহায্য করার জন্যই ইন্দুকে এখানে রেখেছেন। ইন্দুর উপরেই আমার ভবিষ্যৎ কর্ম সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছিল। সেই জন্যই 'রিফাইতপুর ধর্মঘটের' সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কতকটা দুর্নামের ভাগ নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। রাত্রে ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলাম "ইন্দু, তুমি যে আমাকে দাদা বলো সেটা মুখে—না অন্তরে?"

ইন্দু—"আমার দাদা বিদেশে, কবে যে ফিরবেন এবং ফিরবেন কিনা তাও জানিনা, আপনাকে ঠিক আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতই মনে করি। জমিদারের সূত্র হিসাবেও আমরা এক সূত্রে বাঁধা।"

আমি—"ভগবানের নামে শপথ করে বল, আমার সঙ্গে মরতে প্রস্তুত আছ কি না?"

ইন্দু—"আপনার সঙ্গে মরতে ও আপনার জীবন রক্ষার্থে আমি আজ হতেই নিজ জীবন উৎসর্গ করলাম, আপনার আদেশ পালন করাই আমার কাজ। ভগবান্ ও ধর্ম সাক্ষী রেখে এ কথা বলছি, তবে এ কথাও বলছি, আমাকে বিপদে ফেলে আপনি যেন চলে যাবেন না।"

আমি—"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! বলপূর্বক সরিয়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য

কিছুতে আমাকে আটক করতে পারবে না, আমিও জীবন দিয়ে তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবো।" নেশা ছাড়ার জন্য তাকে অনেক বোঝালাম। ইন্দু আমায় জানালো, "এতদিনের নেশা একেবারে ত্যাগ করতে পারবো না। তবে চেষ্টা করবো। এই যে কর্মশক্তি সবই ঐ নেশার কাছেই পেয়ে থাকি।"

আমি—"নেশা তো করি না তবু কি তোমার চাইতে কম খাটছি, একটু ভেবে দেখো—বিজয়বাবুর মত মহা সমাদরে আমিও জমিদার বাড়ী স্থান পেতে পারি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা নয়, আমাকে চাষাদের মাঝেই থাকতে হবে। হয় তো এ জন্যে অভিজাত সম্প্রদায় আমাকে কিছুটা হীন চক্ষেই দেখে থাকবেন। আমার আকুল কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে হয় তো সকলে একটু মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ইন্দু, নেশা ত্যাগ করে তোমায় মানুষ হতে হবে।"

ইন্দু—"আশীর্বাদ করুন যেন তাই হতে পারি, তবে জানেন আমি ছোট বয়স হতেই নিজেকে 'নেশাখোর রূপে' দেখছি, ওটা যেন জন্মগত হয়ে গেছে। আমার ঐ দোষে আমায় ঘৃণায় ত্যাগ করে জমিদার বাড়ী উঠবেন না, তা হলে প্রজারা কিন্তু আপনাকে জমিদারদের লোক বলেই ধরে নেবে। জমিদার বাড়ী আশ্রয় নিলেই প্রজাদের সহানুভূতি হারাবেন। নেশা শীঘ্রই ছাড়বো জানুন।" চিন্তা করে একটা বিষয় ঠিক করলাম, ইন্দুকে জানালাম—"প্রজাদিগকে একত্রিত করার জন্য কিছু সাঙ্কেতিক শিক্ষা সকলকেই দিতে হবে। আজ রাত্রি ১২টার সময় যে যেখানে আছে 'সাঙ্কেতিক ধ্বনি' করা মাত্র যেন সকল গ্রাম হতে তার প্রতিধ্বনি হয় এবং দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে দূরের গ্রাম প্রধানরা, নিকটের লোকেরা পায়ে চলে উপস্থিত হয়। প্রধানদের আগমন কিন্তু বাধ্যতামূলক বলে গণ্য থাকবে। যাও এখনি বের হয়ে যাও প্রচারে। দৌলতপুর থানা এলাকায় (যাকে পূর্বে বিফাইতপুর বলেছি) আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।" "তাই হবে" বলে ইন্দু তার কালো টাট্টু ঘোড়া নিয়ে চলে গেল।

সকালে সাতটায় ইন্দুর মাকে প্রণাম করে থানায় অবিনাশদার বাসায় উপস্থিত হলাম, তিনি তখন বাসাতেই ছিলেন। এত সকালে আমায় দেখে তিনি কি চিন্তা করলেন যেন, আমাকে সাদর আহ্বান জানালেন, ছেলেমেয়েদের কুশল প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমায় বললেন এই তো মাত্র মেদিনাপুর কোং রাজসাহী ও পাবনা এলাকায় ধর্মঘট আরম্ভ করেছ, এর মধ্যেই এমন কি পাকা-পোক্ত হয়ে গেল যে তুমি নদীয়া এলাকায় ছুটে এসেছো? আমার মনে হচ্ছে

এটা ভুল হল, ফিরে গিয়ে দেখবে সব ভেঙ্গে গেছে, এত তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত হয় নি। তুমি জাননা সোমেশ্বর! এই সাহেব কোংকে এঁদের সকল কাজেই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য অসীম। যাই হোক এখন আবার রিফাইতপুর কেন এলে বলো?"

মৃদু হেসে উত্তর দিলাম "বুঝতেই তো পারছেন দাদা, কেন এসেছি। একটা বিরাট দস্যুর মাত্র একটি অঙ্গের ক্ষতিতে কি হবে? তাকে ধ্বংস করতে হবে, ধ্বংস করতে পেলে আগে তার সকল অঙ্গকে বিকল করে দিতে হবে! ধর্মঘটের ঢেউ এখন পদ্মার জলোচ্ছ্বাসের মত দু কুল প্লাবিত করতে চলেছে তাই আমি এসেছি বাঁধ কাটতে! যাত্রা শুরু করার আগে আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাতে ও ইন্দুকে কাজে লাগাতে। আপনার আদেশ এখন জানতে চাই, আপনার পূর্ব প্রতিশ্রুতি কি পুলিশী চাল, না সত্যি কিছু আছে?"

আমার শেষের কথা কয়টিতে তিনি আহত হয়েই দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি সে রকম পুলিশ কর্মচারী নই—দুষ্টের দমন চাই। সে হিসাবে মেদিনাপুর জমিদার কোং মত দুষ্ট আর কোথাও নেই। আমার বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে তুমিই পারবে, তোমার চেহারায় কথাবার্তায় প্রথম দিনই আমি প্রমাণ পেয়েছি 'সোমেশ্বর দাবাগ্নির সৃষ্টি করবে।' আমিও ইতিমধ্যে প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কতদুর এগিয়েছি শুনলেই বুঝবে। ইতিমধ্যে উপরওয়ালাদের কাছ হতে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে, আমি সেই তদন্তকে একটা সামান্য উপহাসের 'বস্তু' মাত্রে পর্যবসিত করেছি, তুমি ভাই নিশ্চিন্ত থাকো! তোমার অবিনাশদা পুলিশ হতে পারে, মদ খেতে পারে, কিন্তু সে মাতাল নয়। অবিনাশ ব্রাহ্মণ! মিথ্যাকে ঘৃণা করে।"

আমি লজ্জিত ভাবে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলাম ও ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। তিনি সস্নেহে আশীর্বাদ দিলেন, এখানে কাজ কতদূর কি হল তা জানতে চাইলেন। অকপটে তাঁকে সব জানালাম, তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। অবিনাশদার বাসায় আহারান্তে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দুপুর কাটিয়ে, বিকালে স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে জমিদার সুরেন্দ্রনাথ আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করলাম। বিজয়লালই চারণ কবি বর্তমানে। সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রজাদের কথা নিয়ে আলোচনাও হলো। সুরেন্দ্রবাবুর কাছ হতে অনুযোগপূর্ণ তিরস্কার লাভ করলাম, সবগুলিই নীরবে বহ করলাম—তাঁকে

বুঝাতে চেষ্টা করলাম তাঁর জমিদারীতে 'ধর্মঘট' ব্যাপারে আমি মুখ্য কারণ নই, গৌণ কারণ মাত্র। আমার 'কৃষক আন্দোলনে'র ঢেউ বহুদূর হতে এখানে এসেছে। কোন দেশী জমিদারদের বিরুদ্ধে 'প্রজা বিদ্রোহ' ঘটানো আমার উদ্দেশ্য নয়। মেদনাপুর জমিদারী কোং অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করতে কৃতসঙ্কল্প, সেই কাজের আংশিক উত্তেজনায় আপনার এই ক্ষতি হয়েছে। আমি না এলে এই সব মূর্খ ও উত্তেজিত জনতা কর্তৃক অনেক অত্যাচার সাধিত হতো।"

বহু রকমে বুঝিয়েও তাঁকে আমি শান্ত করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এটাও জানালাম "সাহেব কোং অত্যাচারের সমানই প্রায় আপনার এ অঞ্চলের অত্যাচার—আপনার উচিত অত্যাচার বন্ধ করে প্রজাদের সঙ্গে মীমাংসা করা।"

তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই আমাকে জানালেন সে বিষয়টা তাঁর বিবেচনার উপরই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। আমি তাই স্বীকার করলাম এবং তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে আসার সময়ে জানালাম, "আর আমি আপনার জমিদারীতে আসবো না।" তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনি বাকা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন। নিজেদের অজ্ঞাতে উভয়ে কখন যে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়েছি জানি না, চকিতভাবে চেয়ে দেখি উভয়ের আঁখিজলে দুজনেরই গণ্ডস্থল সিক্ত, ছোটছেলের মত দুজনেই কেঁদেছি, ঐ আঁখিজলের মধ্যেই বিদায় নিলাম। বিজয়লালও আমায় প্রতি-নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করলো, "রাত্রে আবার দেখা হবে" বিজয়কে বলে তখনকার মত বিদায় নিলাম। যে সকল প্রজারা আমার সঙ্গে এসেছিল তাদের সঙ্গে পথে মিলিত হয়ে সব তাদের জানালাম—"সুরেনবাবুর কথা তো আপনারা শুনেছেন, মনে হয় সহজে কার্যোদ্ধার হবে না, ধর্মঘট খুব জোরের সঙ্গে রক্ষা করে চলতে হবে।"

সকলকে বিদায় দিয়ে পুনরায় দৌলতপুর থানায় এলাম। অবিনাশবাবু ইন্দুর কাছ হতে আজকের কর্মতালিকা জানতে চাইছেন দেখলাম। ইন্দু কিন্তু নানা কথায় এড়িয়ে চলছে, আমার একটু ইঙ্গিতেই ইন্দু অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করলো। ইন্দু জানালো ঢাক, ঢোল কিংবা শঙ্খধ্বনি যাই কিছু মুহুর্মুহুঃ বাজতে থাকলেই চারিদিকে অনুরূপ বাজতে থাকবে, প্রথম যেখানে ঐ বাদ্যের উৎপত্তি, সেখানে দিনের বেলা পতাকা ওড়াতে, পতাকার পাশে মশাল নড়তে থাকবে, তাহলেই চতুর্দিকের গ্রাম হতে লোক ঐ পতাকা বা আলোর নীচে সমবেত হবে। দূরবর্তী গ্রামের লোককে পথপ্রদর্শনের জন্য, গন্তব্য পথের সন্ধিস্থলে রাত্রে

মশাল হাতে লোক দাঁড় করানো হবে এবং কোন্ দিকে যেতে হবে ঐ লোকই বালে দেবে।

ইন্দুর সঙ্গে ঠিক রাত্রি বারটার সময়ে রিফাইতপুর হতে হলুদপুর যাবার পথে একটা ডাঙ্গায় এলাম। দাঁড়িয়েই ইন্দু একজন ঢাকিকে ঢাক বাজাতে হুকুম দিল, ঢিবিটার ওপর বাঁশ পুঁতে তাতে পতাকা টাঙ্গানো হল, মশাল জ্বালানও হয়েছিল। ঢাকের বাদ্যের অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকেই ঢাক ঢোল ও শঙ্খরোল উঠলো, সেই অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে পদব্রজে ও ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে বহু লোক আসতে আরম্ভ করলো, মনে হতে লাগলো বুঝি ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। চতুঃ-পার্শ্বস্থিত গ্রামের ঐ বাজনা ও শঙ্খরোল রাত্রিকে তোলপাড করে তুললো, এক ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়সওয়ার পরামানিকরা এসে পৌঁছুলো, বলাবাহুল্য যে 'বিজয় লাল'ও স্থির থাকতে পারে নাই, এসেছেন।

সভা আরম্ভ হলে আমি বিজয়লালকে সকলের সামনে ধরে পরিচয় দিলাম। ইহাও জানলাম, আমাকে বাধ্য হয়ে স্থানান্তরে যেতে হবে, এই বিজয়লালের হুকুম ব্যতীত কেহ যেন কোন অন্যায় বা অসাধুতাপূর্ণ আচরণ না করে। বিজয় লাল স্বরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে থাকলেও আমাদেরই লোক। স্বরেনবাবু কি করেন বা না করেন তাই দেখার জন্যই ওকে ঐ বাড়ীতে রাখা হয়েছে। শেষোক্ত কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু তখন মিথ্যা না বললে বিজয়লালকে প্রজাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করানো অসম্ভব হতো, হয়তো আমার এই মিথ্যা কথায় বিজয়লাল মনে দুঃখ পেয়েছেন, অন্তরের মধ্যে প্রতিবাদও করে থাকবেন। তৎকালে আমার মর্যাদাহানি হবে বলে কোন কথাই প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন নাই। বক্তৃতামঞ্চে উঠেই বিজয়লাল 'কৃষকদের ধর্মঘট' কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ এবং ধর্মঘটের মধ্যে যে কয়টি অত্যাচার সাধিত হয়েছে তার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। বক্তৃতা শেষ করার সময়ে এ কথাও বলেন "সোমেশ্বরদা ভিন্ন কংগ্রেসের নাম নিয়ে, কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ এরূপ কাজ কেউ করেন নাই, সকল দায়িত্ব সোমেশ্বরদার নিজের।"

এই কথায় প্রজারা অনেকেই বিচলিত হয়ে উঠছেন দেখে আমি সকলকে জানালাম যে প্রিয় বিজয়ভাই-এর কথা সব সত্য, কিন্তু এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই। এ অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আনতে হলে, প্রজাদের আগে অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতই এ কাজের সকল দায়িত্ব আমার। তবে

একজন মাত্র আমায় পাঠিয়েছেন বাংলার তথা ভারতের দেশবন্ধু সি, আর, দাশ মহাশয়। সমবেত প্রজাগণ সকলে 'দেশবন্ধু কি জয়!' ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুললো।

সকলকে শান্ত ও নিরুপদ্রব থাকতে ও সম্মানজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট বজায় রাখতে বললাম। 'আল্লা-হো-আকবর!' 'গান্ধীজী কি জয়'! 'বন্দে মাতরম্'! 'দেশবন্ধু কি জয়' ধ্বনির মধ্যেই আমি সে স্থান ত্যাগ করে 'হলুদ-বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ৩।৪ জন পরামানিক সঙ্গে চললো, বিজয়লাল ভাইকে বললাম "যদি সম্ভব হয় তবে আগামীকাল হলুদবাড়ীতে হাট আছে, হাট শেষে মিটিং আছে, ঐ স্থানে আমার কাছে এসো, ইন্দুও যাবে।"

রাত্রি তিনটায় বিলাসবাবুর গদীতে পৌছলাম, কখন যে রাত্রি প্রভাত হয়েছে জানি না। ইন্দুর ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করলাম ও জলযোগ শেষ করে ইন্দুকে বললাম আজ হতে আর এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই, যতক্ষণ না 'সোনাইকুণ্ডি' 'মহিষকুণ্ডি' 'হরিশঙ্করা' প্রভৃতি নীল কুঠির কাজ বন্ধ না করতে পারা যায়, ততক্ষণ দিবারাত্র আমার সঙ্গে তোমাকেও কাজ করতে হবে। আজ সন্ধ্যার পর হলুদবাড়ীর নদী পার হয়ে চড়ের এলাকায় প্রবেশ করবো, তুমি এখনি বাহির হয়ে যাও এবং সারা রাত্রের মত মিটিং-এর বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করো, একের পর এক এদিকের সব গ্রামগুলিই শেষ করবো; উদ্দেশ্য সকালেই যেন এ. অঞ্চলের সব 'নীল কুঠির' কাজ বন্ধ করতে পারা যায়। জেনারেল ম্যানেজার হঠাৎ যেন সংবাদ পান তাঁর এ অঞ্চলের সব কুঠির কাজই বন্ধ হয়ে গেছে। কোনরূপ বিরুদ্ধ বন্দোবস্ত করার আগেই 'ধর্মঘট' পাকা হয়ে যায় যেন। কার্যতঃ তাই হল। লোকের মুখে মুখে চড়ের ভিতর সভার কথা প্রচারিত হতে লাগলো, ইন্দুও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল। সমস্ত দিনই লোক-জন ছুটাছুটি করতে লাগলেন, নিজ নিজ গ্রাম হতে বিলাসবাবুর গদী পর্যন্ত।

চারিদিক হতেই আমার আহ্বান আসতে লাগলো—সভা করার জন্য। আমি তো বুঝতেই পারলাম না, কিরূপে এত আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লো সকলে। এ যেন সেই শ্রীভগবানের 'ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব' আমাকে কেবলমাত্র নিমিত্ত-মাত্র হতে হবে বলেই অপেক্ষা চলছে। সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বললাম, "এখন আমার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, ইন্দুভূষণের হাতে সভা করার সব ভার ও সম্পূর্ণ কাজ করার ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আমাকে

সভায় নিতে হলে আগে ইন্দুর সঙ্গে ঠিক করতে হবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই আমি নদী পার হয়ে চড়ের এলাকায় পড়বো, ইন্দু চড এলাকায় গিয়েছে, আপনারা তার সঙ্গে দেখা করুন।"

ঠিক নিয়মিত সময়েই হাট আরম্ভ হল। হলদবাড়ীতে বড়রকমের মেলা বসেছে বলে ধারণা হতে লাগলো। বিকালেও একটি নদীর ধারে সভা হল। ঐ সভায় দেশের বর্তমান অবস্থা, কংগ্রেস কি এবং কি চায়, অত্যাচার সহ্য করাও মহাপাপ, অত্যাচারকে উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, একতা বলে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে, সেটাও তাদের বুঝিয়ে দিয়ে, ধর্মঘটে যোগদিতে আহ্বান করা মাত্র সকলে একবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করলো। সভাস্থ সকলকে হাত তুলে রাজী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হতাম না, এটাই ছিল আমার নিয়ম। কেউ যদি হাত না তুলতো, তবে তার কারণ নিরাকরণ না করে ছাড়তাম না। প্রথম দু'এক জন হাত না তুলে জানতে চাইতেন—আমি তাদের ছেড়ে পালাবো কি না।

এর উত্তরে তাঁরা শুনতেন, "আমার উপর নির্ভর করে যদি ধর্মঘট করতে রাজী হন তাহলে যেন সে ভুল তাঁরা না করেন। আমি একজন সামান্য মানুষ, আমার জীবনের স্থিরতাও নেই কারণ মানুষ মাত্রই 'মরণশীল'। আজ ভাল আছি কাল কেমন থাকবো তারই বা ঠিক কি? আমি যে ঘুষ খেয়ে সাহেবদের দলে ভিড়বো না তারই বা প্রমাণ কি? আমাকে সাহেবরা যদি খুন করে বা জেলে দেয় তখন কি হবে? সবার উপর আমি যে বহুস্থানের দায়িত্ব নিয়েছি। সকলেই যদি আশা করেন, আমি সবার সঙ্গে থাকবো, তা কি সম্ভব? এ রকম অবস্থায় আপনাদের মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে ধর্মঘটে নামাতে পারি না। আপনারা যদি নিজেদের মনের বল ও প্রাণের সাহস আছে বুঝে থাকেন, অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা যদি থাকে তবে এ কাজে আসুন, নচেৎ আসবেন না। আমার প্রতিশ্রুতির মূল্যই বা কতটুকু? প্রয়োজন হলে ফাঁসির দড়ি যাহার জীবনের মহাপুরস্কার! যে ব্যক্তিকে সকলের আগেই কামানের গুলির সম্মুখীন হতে হবে, তার কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়ে লাভ কি? আমি নিজেই তো নিজের কর্তা নই, এখনি যদি ইন্দু ডাক দেয় তবে এই মুহূর্তেই তার ডাকেই ছুটতে হবে। আমার শিয়রে জেল। অত্যাচার, যন্ত্রণা, অনিদ্রা, অনাহার এইসবগুলিকে যদি হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তবে দেশ ও দেশের মুক্তি আনার জন্য আমার

সঙ্গে আসুন। একমনে ধর্মকে, ভগবান্‌কে, খোদাকে সাক্ষীরেখে, আমার কথায় বিশ্বাস করে আসুন, সাথী কেউ নেই শুধু উপরের খোদা বা ভগবান্ আছেন, জয় সুনিশ্চিত।

প্রতিমুহূর্তে বংশপরম্পরায় অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা এই আমাদের ওপরেই সকল অত্যাচার শেষ হোক। হয় মৃত্যু নয় তো মুক্তি! এর মধ্যবর্তী কোন স্থান নেই। যা ভাল বিবেচনা হয় করতে পার আমি তোমাদের ধর্মঘটে নামিয়েই খালাস, সেটা রক্ষা করার ভার তোমাদের হাতে। আমার সমস্ত কথা ও শর্ত খুলেই বললাম। যদি ধর্মঘট করতে মন চায় তবেই ধর্মঘটে যোগদান করবে, নচেৎ নয়।" চারদিক হতেই সকলে বলতে লাগলো "এতদিনের ভয় কি একঘণ্টার বক্তৃতায় যায়? তবু এবার আমরা বুঝেছি, আপনাকে কাছে পাওয়ার আশা খুবই কম। যদি আইনে আটক না পড়েন তবে হয়তো বা আসতে পারবেন নচেৎ এই আসাই শেষ। হয়তো আর আপনাকে দেখতেও পাবো না, আমরা যদি একমত হয়ে কাজ বা ধর্মঘট না করি তবে আপনি কি করতে পারেন, এই যে একতাবদ্ধ ধর্মঘট আরম্ভ করালেন এই যথেষ্ট।"

উপস্থিত সকলে বার বার চিৎকার করে জানাতে লাগলো "আমরা ধর্মঘটে যোগ দিলাম। ধর্মঘট আরম্ভ করলাম। এখন আমরা পরিস্কারভাবে বুঝেছি। আপনাকে আর কোন কষ্ট করতে হবে না।" যখন জনতা বার বার তিনবার হাত তুললো তখন জয়ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ করলাম। এইসময় ইন্দু এসে "চড়ের মধ্যে চলুন সব ঠিক হয়েছে" বলে ডাক দিল।

বিলাসবাবুর জননী আমায় পুত্রাধিক স্নেহ করেন। অন্দরমহল হতে তাঁর ডাক এলো, অন্দরে গিয়ে তার কাছে আতপান্ন ঘি দুধ সহযোগে আহার করলাম। আহার শেষে মায়ের পদধূলি মাথায় নিয়ে বাইরে এলাম।

বাইরে এসে দেখলাম বিজয়লাল এসেছেন, ইন্দুর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে বিপদগামী দেখে বিজয়ভাই আজও দুঃখিত এবং আমাকে ঠিক পথে আনার জন্য বহু চেষ্টাও করলেন। আমরা উভয়ে নদী পার হয়ে চড়ের মধ্যে ঢুকলাম, ইন্দু কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পিছনে আসছিল।

বিজয়লাল আন্তরিকভাবেই আমাকে ফিরাবার জন্য যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করতে লাগলেন। পূর্বের মত 'কৃষক আন্দোলন' কংগ্রেস কর্ম কিনা এই নিয়ে আলোচনা হল অধিক। শেষে স্থির হল, "ভবিষ্যতে 'কৃষক আন্দোলন'

কংগ্রেস কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কাজ হতে পারে কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতির বহির্ভূত! শুধু বহির্ভূত বললেও ঠিক হবে না, এই কাজ করলে 'কংগ্রেসদ্রোহী' হতে হবে।"

আমি বিজয়কে রুক্ষভাবেই বলেছিলাম "আমাকে যে কংগ্রেসেরই হতে হবে, তারই বা এমন কি বাধ্যতা আছে? আমাকে বিদ্রোহী মনে করেই বাদ দেওয়া ভাল। সারা ভারতের পক্ষে যেটুকু অঞ্চলে আমি কাজ করছি সেটুকু অতি তুচ্ছ সন্দেহ নেই। আমার নিজদায়িত্বে আমি যদি একটা ছোটখাটো 'কৃষক আন্দোলন' চালাই তাতে কংগ্রেসের বা কি ক্ষতি? কংগ্রেস কি ভারতের প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে তার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাতে পেরেছে? প্রথম ও প্রধান বিভাগেই প্রমাণ হচ্ছে 'না, কো-অপারেশন'এ 'ননকোঅপারেশন' (সহযোগী ও অসহযোগী) যেমন দুটি দলের কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার কর্মপদ্ধতি না হয় চাষাড়ে! কিন্তু দেশের স্বাধীনতা, কংগ্রেসের দুটি দলই চাইছেন স্বাধীনতা! এ ক্ষেত্রে আমার দোষ কোথায়? আমি কংগ্রেসদ্রোহীই বা হবো কেন? আমি কংগ্রেসের নাম, গান্ধীজির নাম, দেশবন্ধুর নাম ব্যবহার করি তাই কি আমার দোষ? যদি বারণ করো তবে আর করবো না, এতে কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব না, কংগ্রেসই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যেটুকু কাজ হোক না, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে কংগ্রেসের।" যাই হোক ইত্যবসরে আমরা চড়ের প্রথম সভাস্থলে এসে উপস্থিত হলাম।

সভায় কেবল 'অত্যাচার নিবারণকল্পে' যে ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে তাতে যোগ দেবার আহ্বান ও সাহেবরা কতদূর অন্যায় ভাবে শোষণ ও শাসন করে উপরি পাওনার মত 'বেগার' আদায় করে তাই জানানো ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু শোনার জন্য প্রজারা উৎসুক থাকতো না, সভায় বিজয়লাল বলতে উঠে কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতি প্রচার করে ঐ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে বললেন, পুনরায় প্রকাশ্যে আমাকেও ঐ কর্মপদ্ধতিতে কাজ করতে বললেন।

আমার পূর্ব প্রথানুযায়ী সকলকে হাত উঠিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করালাম ও বিজয় ভাইকে জানালাম 'ভাই! 'আমি বহুদূর এগিয়ে এসেছি, আর ফিরতে পারি না, ফেরাবার চেষ্টা করা বৃথা! আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই।' আমি তার নিকট বিদায় নিলাম। অন্য কয়েকজন ও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভিন্ন গ্রামের সভাস্থলের উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারেই রওনা হলাম। কিছুদূর গিয়েই পিছন

ফিরে একবার দেখলাম—বিজয়ভাই তখনও যেন আমার প্রত্যাবর্তনের আশায় বসে রয়েছেন। মনে মনে কষ্ট পেলাম কিন্তু তখন সময় নষ্ট করার উপায় নেই। বিরাট দানবের কুক্ষিমধ্যে তখন বিচরণ করছি, অচিরে তাকে বিকলাঙ্গ না করতে পারলে সে যে আমাকে হজম করে ফেলবে। প্রতিনিয়ত কে যেন দুর্জয় টানে সামনের দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ভিতর হতে কে যেন আমায় অত্যন্ত চঞ্চল করে তুলছে। এ যেন ছোট কাষ্ঠফলক অবলম্বন করে দিক্‌ভ্রষ্ট ভাসমান নাবিকের দূরচক্রবালের মৃত্তিকার দর্শন! সেই সময়ে ঐ নাবিক যেমন প্রাণপণে সেই সমুদ্রকূলের দিকে ছুটতে থাকে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই কৃতকার্য হবার ক্ষীণ আশায় মহান্ উৎসাহে বুক বেঁধে আকুল আগ্রহে ছুটে চলেছি। দেহে তখন অসীম বল, প্রাণে তখন আকুল আকাঙ্ক্ষা, মনের মধ্যে অনন্ত সাহস। সে সময়ে যে সোমেশ্বরকে দেখেছে, সেই মহা উৎসাহের, বহ্নি-শিখার দুর্বার আকর্ষণে পতঙ্গের মত তার সহচর না হয়ে থাকতে পারে নি। শ্রীভগবান্‌ই যেন রুদ্রতেজে আমার মধ্যে খেলা করে চলেছেন।

সুদীর্ঘ ১৭ বছর পর, আমি ১১০ নং বেনিয়াটোলা স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকা-কালীন একদিন (সূর্যোদয়ের আগেই) উদিত সূর্যরূপে বিজয়লাল ভাই এসে হাসিমুখে হাজির হলেন, 'দাদা! আজ আপনার পায়ের ধুলা নিতে এলাম। ১৭ বছর পর কংগ্রেস আপনার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলো।' বিজয়লালের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে গেল—ইলা বউমা নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে যাই এবং যোগাযোগ রাখি।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই দু-তিনটি কুঠিতে 'ধর্মঘটের' আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। সকাল হতেই ঢাক ঢোল বাজতে লাগলো, শোভাযাত্রা কীর্তন বার হলো, সমস্ত দিনই সভা চলতে লাগলো, ঠিক যেন 'ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন'-মত। যেখানে যাই সেখানেই ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে যায়। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ অঞ্চলে একটা সাড়া পড়ে গেল।

শিকারপুর Concern-এর Chief ম্যানেজার Mr. M. N. Croford-এর আসন টলে উঠলো, হঠাৎ বিনা মেঘে 'বজ্রপাতের' মত সাহেব ধর্মঘট বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত হলেন।

এক সপ্তাহ ঘুরে ডাং-এর বাজারে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হলো। সেই সভায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোক সমবেত হয়েছিল। এই সভাতেই এ

অঞ্চলের কাজ এক প্রকার শেষ হয়েছিল। সাহেবদের সকল কুঠিতেই সে ধাক্কা লাগলো। পুলিশও উঠে পড়ে আমার 'পশ্চাদ্ধাবন' করতে লাগলো। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার গুজবও প্রতিনিয়ত শুনতে লাগলাম। আমি কিন্তু জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করতে লাগলাম। প্রতিনিয়ত আমার পেছনে ঘুরে বেড়ানো পুলিশ কর্মচারীদের পক্ষেও কঠোর কর্তব্য হয়ে পড়লো। তাঁরাও আমার ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় আমাকে গোপনে সাহায্য করতে লাগলেন ও আমার বিরুদ্ধে পুলিশের বড় কর্তারা কি কি ধারায় স্টেপ্ নিতে চান তাও যথাযথভাবে জানাতে লাগলেন।

এই সময় নাগপুরে একটি সভা হলো। সভায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক এসেছিল। ইন্দুও ছায়ার মত আমার সঙ্গে ঘুরেছিল। অনেক সময় অত্যধিক কাজের চাপে সময়মত খাওয়াও হত না। এই কয়েকদিনের অত্যধিক পরিশ্রমে আমাদের অনেকটা রুক্ষ ও শুষ্ক করে তুলেছিল। ইন্দুর মুখের দিকে চাইলেই মনে হতো বড়ই শ্রমক্লিষ্ট, কিন্তু কাজের জন্য আহ্বান এলেই ইন্দুকে যেন উৎসাহের প্রতিমূর্তি মনে হতো; তাকে না পেলে আমার কাজ এত দ্রুত শেষ করতে পারতাম না! তার দুর্জয় সাহস ও কর্মশক্তি আমাকে পদে পদে সাহায্য করেছে। শ্রীভগবান্ সব কাজ আগে হতেই সাজিয়ে রেখেছেন যেন।

ডাঙ্গের বাজারে নিধুবন ভৌমিক ও তাঁর সহকর্মীগণ আমাকে অকাতরে সবরকম সাহায্য করেছেন। তাঁদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আমাকে আমরণ কিনে রেখেছে। সাহেবদের অত্যাচারকে চূর্ণ করার জন্য যে সকল মানবাত্মা 'জীবন্ত ডিনামাইট' রূপে গুপ্তভাবে অবস্থান করছিলেন সেগুলি যেন ভগবৎ কৃপায় ও ইচ্ছায় আমার স্পর্শে প্রচণ্ড রূপে বিস্ফোড়িত হয়ে এক অদম্য দাবাগ্নির সৃষ্টি করলো। যেদিকে তাকাই দেখি 'ভগবানের অমোঘ কর্মপ্রেরণা' ঐ অঞ্চলের জনগণকে গৃহছাড়া উন্মত্ত করে তুলেছে। সকলেই বলে 'আমার সোমেশ্বর', নগণ্য ক্ষুদ্র সোমেশ্বর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই আপনজন। এখানে সকলেই যেন এক বিরাট 'মানবজাতি', সোমেশ্বরকে বুকে ধরে তারা আনন্দলাভ করে।

সোমেশ্বরের হুকুম তামিল করবার সুযোগ পেলে তারা নিজেরা খুসী হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় আমিও এক নূতন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, নিজেকে মাটির বুকে ধূলিতে লুটিয়ে দিয়ে আমিও সম্পূর্ণভাবে সকলের হতে পেরেছিলাম। ঐ বিরাট জনসমুদ্রের কোথাও কেহ অত্যাচারিত হলে, আমার হৃদয়ে সেই

অত্যাচার দ্বিগুণ ভাবে অনুভব করতাম। অত্যাচারিতকে বুকে নিয়ে তার সকল দুঃখ মুছিয়ে দিয়ে, নিজে নীলকণ্ঠ হবার ক্ষমতা প্রার্থনা করতাম। গৃহ-কোণে গৃহস্থ বধূরাও জানতো যে সোমেশ্বর তাদের পরম আত্মীয় ও সন্তানতুল্য। সোমেশ্বরের কাছে তাদের কোন গোপনীয় অত্যাচারের কাহিনীও গোপন করে রাখতো না; অবাধ্য পুত্রকন্যা কিম্বা কুক্রিয়াসক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে কুণ্ঠিত হত না। তারা জেনেছিল যথাযথ বিহিত হবে সোমেশ্বরের দ্বারা, কন্যা ও জননীদের বিশ্বাস ছিল এই রকম।

জননীর আশীর্বাদে ও শ্রীভগবানের অপার কৃপায় যাকে যা একবার ইঙ্গিত দ্বারাও নিষেধ করেছি কোন কাজ করতে, সে তা তখনি মেনে নিয়েছে। বিবদমান উভয় পক্ষই সোমেশ্বরের ভাই ও স্নেহের বস্তু। পঞ্চায়েত বসেছে নিজেদের মধ্যে এবং নির্বিবাদে কলহের মীমাংসা হয়ে গেছে। যদি কেউ ধর্মঘটে যোগ না দিয়ে গোপনে সাহেবদের কাজে বা হুকুম পালন করতে গেছে, পথে ধর্মঘটীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে লোককে তখনি ঐ পথের মাঝেই ধর্মঘটীরা সোমেশ্বরের দোহাই দিয়েছে—কাজ ত্যাগ করে এখনি ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্য। কর্মে যাওয়াও অনেকেই তো ত্যাগ করেছেন। ভগবানের অপার অনুগ্রহ আমাকে প্রতিপদেই সাহায্য করেছে। আমার নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার কথা চিন্তা করে আমি মনে মনে সঙ্কুচিত হতাম। আমার প্রতি আরোপিত সকল প্রকার সম্মান আমি শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করে আমাকে ঐ প্রজাদের ভালবাসা ও বিশ্বাসের উপযুক্ত করে তোলার জন্য তাঁর কাছে নিয়ত আকুলভাবে প্রার্থনা জানাতাম। মনে মনে প্রায় সকল সময়েই ভগবানকে স্মরণ করতাম। কোন জটিল সমস্যা ঘটলে তার মীমাংসার জন্য প্রার্থনা করতাম। সেই জন্যই হয়ত সকল সমস্যাই সহজে পূর্ণভাবেই মীমাংসা হয়ে যেতো।

প্রজাদের করুণ মুখচ্ছবি সব সময়ে আমার প্রাণের মাঝে ছায়াচিত্রের মতো ভেসে বেড়াতো। ভগবান্‌কে যখইন ডেকেছি তখনই তাঁর অস্তিত্ব-প্রেরণা অন্তরে উপলব্ধি করেছি।

এই সময়ে শিকারপুর হতে ডাক এলো। এক 'মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও হল। সুখময় চৌধুরী নামে একজন কর্মীই আমাকে নিয়ে যেতে এলো। হাউলো নদীর পাড়ে শিকারপুর গ্রামে আমার সঙ্গে অনেক লোকই এলেন। ঐ সময় ইন্দু আমার কাছে বিদায় নিয়ে এল, কারণ তার এই এলাকার

কাজ প্রায় সারা হয়ে এসেছিল এবং বাড়ী ছাড়াও বহুদিন ও বহুদূরে, তথায় ধর্মঘটের অবস্থা কতদূর কি হলো তাও জানা দরকার। বিদায় নেবার সময় ইন্দু ছোট ছেলের মতই উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ফেললো, তাহাকে সান্ত্বনা দিলাম যে সুযোগ পেলেই দেখা করবো। বিজয়ভাইকেও ভালবাসা জানালাম। আমার পদধূলি নিয়ে ইন্দু তার ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করলো। হাউলো পাড়ে বিদায়ের সেও এক করুণ দৃশ্য! এপারের সকলেই বিদায় নিলেন।

নদী পার হবার সময় পাটনী বললো, 'দিনরাত্রি সাহেবদের লোকজন, মায় গাড়ী টম্‌টম্‌, সবই বিনাভাড়ায় পার করতে হয়। আমার প্রতি আপনার কি আদেশ? আগে বলে দিন তবে আপনাকে পার করবো।'

পাটনীকেও সকলের সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দিতে বললাম এবং সকলকে বললাম বিপৎকালে যেন পাটনীকে সাহায্য করে এবং ওর প্রতি সবাই লক্ষ্য রাখে।

শিকারপুর—সত্য সত্যই স্বীকার করতে হবে যে শিকারপুর একটি সুসজ্জিত সুন্দর গ্রাম! গ্রামে প্রবেশ পথেই আকাশস্পর্শী বড় বড় ঝাউগাছবেষ্টিত নীলকুঠির হাতা। দূর হতে বড়ই মনোরম দৃশ্য। রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী চারিদিকের দীনতাকে ব্যঙ্গ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় গোয়ালঘরের মত লম্বা টানা চালাঘর মজুরদের ঠাঁই দেবার জন্য। কুঠির সামনে লোকালবোর্ডের রাস্তা—মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা চলে গেছে। একটু দূরেই শিকারপুর পোঃ অফিস ও টেলিগ্রাম অফিস। কাছেই দাতব্যচিকিৎসালয়, একটু দূরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। স্কুল হতে একটু দূরে হাটতলা। আমরা হাটতলার উপর দিয়েই চললাম শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। এই ভট্টাচার্য মশাইয়ের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ইনি আর একজন লোক, যাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমার এই কর্মজীবনে সহায় হয়েছিলেন। তাঁদের সাহায্য না পেলে আমার সাধ্য কি আমি এত তাড়াতাড়ি কোনরূপ সাফল্য লাভ করি। শিকারপুর অঞ্চলে তাঁরা দুজনে বন্ধু বান্ধবী ও সাথী গুরু স্থানীয়া। তাঁরা দুজনেই আমার সহায় ও সম্বল। এই শ্রদ্ধেয় দম্পতির কাছে আমি চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাঁদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতাও আমার নেই।

এই হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিলমারিয়া কুঠির অন্তর্গত মাঝপাড়া গঙ্গাবাজারের নায়েব নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশাইয়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। পিতাপুত্রে ব্যবহার ও আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠিক যেন 'নিম গাছে আম' ধরেছে।

যাই হোক, গাঁয়ের অনেকেই তাঁকে খেপাঠাকুর বা খেপা হরেন বলে থাকেন। আমি কিন্তু তার খেপামির কিছু দেখি নি। যা দেখেছি তা তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতা।

আমরা যথাসময়ে তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। সামনে একটু ছোট্টমত ফুলবাগান—গোলাপ গাছগুলি সবই মৃতপ্রায়। জবা ও স্থলপদ্মের গাছ ব্যতীত অন্যগুলিকে প্রাণবন্ত বলে মনে হয় না। কাঁটা তার দিয়ে ঐ বাগানের তিনদিক ঘেরা। একদিকে এই বৈঠকখানা ঘরটি, বৈঠকখানার পূর্বে ভদ্রাসন বাড়ী। বাড়ীর ভিতর তিন-চারখানি মাটির ঘর ও পাতকুয়া। চারদিকে সুউচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর খড়ে ছাওয়া।

তাঁর বৈঠকখানায় পৌছানোর পর হরেনবাবু বাড়ীর ভিতর হতে হাসিমুখে বাইরে এলেন এবং পরিচিত জনের মত 'সোমেশ্বর ভাই এস', বলে আমাকে আহ্বান জানালেন। তাঁর সে আহ্বান যেন আমার মর্মমূল স্পর্শ করলো, আমি হর্ষবিহ্বলচিত্তে তাঁর পদধূলি নিলাম। তিনি সস্নেহে আমায় বুকে চেপে ধরলেন। আমাকে তিনি বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই আমাদের সোমেশ্বর এসেছে।' আমি অবগুণ্ঠিতা দেবীর চরণ স্পর্শে ধন্য হলাম।

পুনরায় বৈঠকখানায় এসে বসলাম। তাঁর এলাকার কিরূপ অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমি বিতাড়িত, ঘৃণিত ও ধিকৃত। আত্মীয়স্বজনেরা আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে ভীত, কারণ আমি তো সাহেবদের হাঁকডাকে যাই না এবং মানিও না। তাদের অত্যাচারের প্রতিকার করতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প; বহু প্রকারে আমাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চলছে কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে এখনও কিছু করে উঠতে পারে নি। এদিকের প্রজারা প্রায় সবাই প্রস্তুত, তবে কি যেন একটা ভয়ে তাঁরা আমার কথা শুনেও শোনে না। বোধহয় আমি গাঁয়ের মধ্যে 'মধুসূদন' বলেই কিছু করে উঠতে পারছি না।

হরেনদার কথা শুনেই বুঝলাম, এঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। দুপুরে খাওয়ার পর বললাম, একটু পরে গ্রামবাসীদের মতামত নিতে হবে। কারণ একবার সকলকেই দেখা দরকার কে কোন্ ধাতে বইতে চায়। বিকালে জানতে পারলাম ভদ্রলোকেরা সকলেই প্রায় আমার আগমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরাও প্রতি মুহূর্তে আশা করেছিলেন যে আমি নদী পার হয়ে নিশ্চয় শিকারপুর আসবো। এখানে আসার সময়ে রাস্তা চলতে চলতে কিছু কথার টুকরা

আলোচনা, 'শিকারপুর যা তা নয়', কেউ বা বলছে, 'সোমেশ্বর যমের মুখেও যেতে পারে'। একজন তো চীৎকার করে উঠেছিল, 'বোধহয় সোমেশ্বর এসে গেল। আর ভাবনা নেই!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্রামের চাষী মজুরদের অঞ্চল ঘুরে যা সংগ্রহ করলাম তাতে বুঝলাম, শিকারপুরকে ধর্মঘটে নামাতে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, কিন্তু শিকারপুরে সাফল্য লাভ করতে পারলেই এ অঞ্চল একপ্রকার আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। যা হোক, পরদিন হতে শিকারপুরের বাইরের সব চড় ও অন্যান্য গ্রামগুলিকে অর্গানাইজ করতে লাগলাম। যখন দেখলাম যে চারদিকই ভিতরে ভিতরে ঠিক হয়ে আছে, তখন একদিন ঐ অঞ্চলে 'হরতাল' করার বন্দোবস্ত করা হলো। সেই উপলক্ষে ক্ষ্যাপা কালাচাঁদকে নিয়ে একটি সংকীর্তন বার করলাম এবং ঐ সংকীর্তনের দলটি ক্রমে ক্রমে এক বিরাট শোভাযাত্রায় পরিণত হলো। দোকান-হাট সব বন্ধ হলো, ঐদিনই সভা করার বন্দোবস্ত করা হলো। কিন্তু মধ্যাহ্নে পুলিশ এসে আমাকে একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ দিয়ে গেল।

ঐ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ফল হলো বিপরীত। এখানে 'ধর্মঘট' করতে হলে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হতো, কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপ আমার কাজকে একদিনেই একমাস এগিয়ে দিল। সে কি প্রচণ্ড আন্দোলন! শারদীয়া মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের সময়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে বলিদানের বাজনাতে প্রাণের মধ্যে ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত যে আনন্দের সৃষ্টি করে আজও তেমনি শঙ্খ ও ঢাক

পাটকেবাড়ীতে সভা আরম্ভ হবার আগেই আমি শুনেছিলাম যে সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে নিয়ে অবিনাশবাবু গ্রামের মধ্যে অপেক্ষা করছেন। গোপনে লোক পাঠিয়ে অবিনাশদাই আমায় সংবাদ দিয়েছিলেন, 'সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছু না জানার ভান করে গ্রামের মধ্যে থাকবো, সভার কাজ শেষ করে যেন সোমেশ্বর চলে যায়।'

আমার ইচ্ছা ছিল অবিনাশদাকে প্রণাম করে ফেরার। কিন্তু ঐ আগন্তুক দৃঢ়স্বরে জানালেন, 'না, প্রণামের প্রয়োজন নেই, চলে যান।' আমার মনে পড়লো অবিনাশদার প্রতিজ্ঞার কথা। পরে শুনেছিলাম অবিনাশদা আমাকে না পাওয়াতে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'মদের নেশাই আমার কাজ পণ্ড করেছে।' আমি কিন্তু জানি মদ খেলেও অবিনাশদা মাতাল হন না, নিজের কাঁধে দোষ চাপিয়ে ব্রাহ্মণ সত্যরক্ষা করেছেন। আমি মনে মনে তাঁকে অসংখ্য প্রণাম জানালাম। আমাকে না পেয়ে সেই গায়ক যুবাকে তিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন।

পাটকেবাড়ীতে 'ধর্মঘট' আরম্ভ যদিও দেরী হত, সেটা ত্বরান্বিত করেছিলেন অবিনাশদাই। 'ধর্মঘট' সফল হ'লে নাম আমার হল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষে সে ধর্মঘট অবিনাশদাই করিয়েছিলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ অত্যাচারী সাহেবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। আমাকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় অনেক জবাবদিহি তাঁকে করতে হয়েছিল, এমনকি তিরস্কৃতও হতে হয়েছিল এজন্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজও তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার মাথা আপনিই নত হয়ে যায়। সব কথা এখন ভাল মনে নেই, হরেনদার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়েছি, তবে ঐ অঞ্চলের প্রায় সব গ্রামেই ঘুরেছি। রামকৃষ্ণপুর চড়ের কাজ শেষ করে শিকারপুর ফিরতে একদিন দেরী হয়েছিল।

রামকৃষ্ণপুর হতে ফিরে দেখি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী সাবডিভিসনের মিড্‌নাপুর জমিদার কোং সাহেবের 'ডোমকল কুঠি'র এলাকা হতে লোক এসে বসে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় জানালাম যে সেখানকার বড় দেওয়ান মহাশয়ের চেষ্টায় ও সদ্ব্যবহারে কুঠির কাজ ভাল ভাবেই চলছে। সেখানে কেহই কিছু করে উঠতে পারেন নি, আমার অপেক্ষাতেই তাঁরা চুপ করে আছেন। রাত্রি প্রভাতের পরই সামান্য একটু জলযোগ করেই 'ডোমকল কুঠি' এলাকায় যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হরেনদার উপরেই শিকারপুরের ভার

দিয়ে। হুইমনেই হাউলো ও পদ্মার উত্তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে যে রাস্তা, ঐ রাস্তার ওপর দিয়েই ডোমকলের দিকে চললাম। বোধহয় বেলা বারোটা আন্দাজ সেখানে পৌছুলাম। গ্রাম প্রবেশের পথপ্রান্ত থেকে আমাকে সাদর সম্বর্ধনা করে গ্রামের ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। সে অঞ্চলের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ হলো। বিশেষ জোরের সঙ্গে সভার কথা প্রচার করতে লাগলাম। প্রত্যেক স্থানে যেমন হয়, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঢাক ঢোলও বাজাতে লাগলো। বেলা সাড়ে চারটার সময় সভার দিকে রওনা হলাম।

রাস্তাতেই বড় দেওয়ান মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। চমৎকার লোক। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে আমি বড়ই পরিতৃপ্ত হলাম। দেখলাম বড় দেওয়ান হবার প্রকৃতই উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁকে কোনমতে এঁটে ওঠা আমার মত অল্পবুদ্ধি যুবার কর্ম নহে। তিনি গোপনে গোপনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছেন যে সেদিনকার সে মিটিং-এর সভাপতি কেহই হতে চাইলেন না। অনেক চিন্তা করে বড় দেওয়ান মশাইকেই সভাপতিত্ব করার জন্য আমি অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, 'আমার মনিব, Samar Filer সাহেবের বিনা অনুমতিতে তা পারবো না। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে ধর্মঘট প্রস্তাব গৃহীত হবে না, তা হলে আমার মনিবের অনুমতি নিয়ে সভাপতি হতে পারি।'

বুঝলাম হ্যাঁ, এতদিন পর এক মহা চতুর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি যে কি করবো কিছুই ঠিক করতে না পেরে তাঁকে জানালাম, 'আমার প্রতিশ্রুতি পেলেই যদি আপনি সভাপতি হতে পারেন তবে তাই আমি দিচ্ছি, কিন্তু প্রজারা যদি নিজেরা কিছু করে সেক্ষেত্রে আমার কোন দোষ গ্রহণ করতে পারবেন না।' দেওয়ান মশাই সহাস্যেই বললেন, 'আমার প্রজাদের জন্য ভাববেন না, আমার সামনে মাথা তুলে ধর্মঘট করার মন্তব্য প্রকাশ করবে, স্বপ্নেও তা চিন্তা করবেন না। আপনি ধর্মঘটের প্রচার না করলে কেউ তা করবেন না।' ঐ শর্তানুযায়ী বড় দেওয়ান মশাইকে সভাপতি করে সভা আরম্ভ হলো। ঐ সভাকে জনসমুদ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সভায় সকলকে কংগ্রেসের মতবাদ ও অত্যাচার নিবারণের জন্যই যে কংগ্রেস তা বুঝলাম। কংগ্রেস কোন লোক বা অন্য কিছু নহে, একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মাত্র। উপস্থিত সভার লোকগুলিকে বাদ দিলে কংগ্রেসের কোন মূল্যই নেই। কতকগুলি লোকের একতাবদ্ধ দল ও কংগ্রেস মতানুবর্তিতাকেই কংগ্রেস বলে।

এ ক্ষেত্রে আমার চোখের সামনে যত লোক আছেন সকলকেই 'কংগ্রেসের লোক' জানতে হবে, কারণ কংগ্রেস অবিচার ও অত্যাচার নিবারণ উচ্ছেদ সাধনকল্পেই স্থাপিত। আমি এককথায় ধরে নিতে পারি কিনা যে, আমার সম্মুখের সকলেই অত্যাচারিত!

হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা মুক্ত কণ্ঠে তোমাদের এই বড় দেওয়ান মশাইয়ের সামনে জানাতে পার যে তোমরা অত্যাচারিত?'

সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্', 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠলো। দেওয়ান মশাই উঠে বলতে লাগলেন, 'কি অত্যাচার তোমরা পেয়ে থাক? সকলে আমার সামনে হাত উঠাচ্ছ কেন?'

জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'আপনি আজ সাধু সেজে সভাপতি হয়েছেন বলে আমরা ভুলবো না। আমরা আর ভয় করি না, মরতে হয় মানুষের মতই মরবো। আমরা কারুর প্রজা নই, কংগ্রেসের প্রজা। সোমেশ্বরবাবু আমাদের গুরু। তাঁর মন্ত্রও আমরা শুনেছি, তাঁর মন্ত্র হচ্ছে 'ধর্মঘট'। আমরা আজ হতে ধর্মঘট আরম্ভ করলাম, কারুর কথা শুনতে চাই না।'

বড় দেওয়ান মশাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সভাপতিত্বেই 'ধর্মঘট' প্রস্তাব গৃহীত হলো। সাহেবদের 'ডোমকলকুঠির' কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দেওয়ানমশাই সভা হতে কুঠিতে পৌঁছুলে Somar Filer সাহেব তাঁকে অযথা তিরস্কার করে বিতাড়িত করলেন। সে রাত্রি সেখানে থেকে পরদিন শিকারপুর ফিরলাম। শিকারপুর ফিরে আরও দু-তিনটি স্থানে সভা করলাম। এখন আর আমাকে কোন কষ্ট করতে হয় না, বাধা দিতেও কেউ নেই। কয়েকদিন চিন্তা করে দেখলাম ১৪৪ ধারা আমাকে বড়ই ছোট করে দিয়েছে এবং নিজের আত্মসম্মানেও বাধতে লাগলো, কিন্তু তখনি ১৪৪ ধারাকে লঙ্ঘন করে জেলে আটক পড়তেও ইচ্ছা হলো না। ঐ নোটিশকে তখন মান্য করাই ভাল বিবেচনা করলাম।

এই সময়ে হোগলবাড়িয়া হতে খবর এলো, ঐ স্থানের কয়েকজন পরামাণিক নাকি একটু গোলোযোগ করছেন। কোন চিন্তা না করে ওদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। সকলেই জানালেন 'ওখানে সভা হলে, শিকারপুর হতে যাঁরা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন, তাঁরা ঐ সভায় যোগ দিতে

পারবেন। যে দু-একজন লোক এক-আধটু গোলযোগ করছে তারা আপনার কথা শুনে ঠিক হয়ে যাবে।'

বেলা বারোটার সময়ে আহারান্তে হরেনদা ও সুখময়কে নিয়ে আমি হোগলবাড়িয়া রওনা হলাম। সেদিন আমার শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত ছিল বলেই গোযানে যেতে বাধ্য হলাম, নচেৎ পদব্রজেই যাই। গাড়ীর মধ্যে আমি আছি জানতে পারলে, প্রজাদের দ্বারা গাড়ীর গতিপথ রুদ্ধ বা মন্দীভূত হবার সম্ভাবনা বেশী, যেহেতু আমাকে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে যেতে হলো। হোগলবাড়িয়াতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা যেন স্বপ্ন! হরিহরচন্দ্রের মেলায় যেমন গরু ঘোড়া ও মোষের মেলা বসে, এও যেন ঠিক তাই। এত গরু-মোষের গাড়ী ও ঘোড়া এসেছে যে চারদিকে ছত্রের মেলার ন্যায় জন্তুসমুদ্র আমদানী হয়েছে। ঐ স্থানের বড় বড় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা মনুষ্যভারে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। সারবন্দী দোকান পাটও বসে গেছে বিস্তর। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ! জয় জয় রবের মধ্যেই সভাস্থলে নীত হলাম। 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগলো। মাত্র একরশি পথ অতিক্রম করতে কুড়ি বাইশ মিনিট সময় লাগলো। সভার কাজ আরম্ভ হওয়া মাত্র ঐ জনসমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। হরেনদার সুললিত বক্তৃতা শোনার পর, সমবেত জনমণ্ডলী আমার আদেশ আমার নিজের মুখেই শুনতে চাইলেন। আমাকে মঞ্চে উঠতে হলো।

শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে সভাস্থ সকলকে অভিবাদন জানিয়ে শান্ত থাকতে বললাম। মাঝে মাঝে বক্তৃতা বন্ধের সময় দেখি বাতাসও যেন ধীরে বইতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আধঘণ্টা কাল আমার এই চাষাড়ে ভাষায় কি যে বললাম তা স্মরণ নেই। বক্তৃতা শেষে সমবেত জনতাকে হাত তুলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করালাম, সমবেত জনতা চলোর্মির ন্যায় একসঙ্গে হাত তুলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। যথানিয়মে পুলিশ ইনেসপেক্টর ও সিপাহী ইত্যাদি আমার সকল সভাতেই থাকতেন, এ সভাতেও ছিলেন। সভা ভঙ্গের পর পুলিশকর্মচারীদিগের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, এই সভার দ্বারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয় নি। যে মাঠে সভা হয়েছে তা শিকারপুর হতে তিন মাইল বাইরে। যা হোক, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ হয় নি, তাই গ্রেপ্তার হলাম না।

শিকারপুর এসে শুনলাম, বাগচি জমসেদপুর হতে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

মশাই তাঁদের গ্রামে সভা করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন। তিনি যে আমার পিতৃবন্ধু তাও জানিয়েছেন। আমিও তাঁকে পিতৃবন্ধু হিসাবে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতাম। প্রথম দর্শনেই তাঁর বাড়ী যাবার জন্য আমায় অনুরোধ করেছিলেন, পুনরায় তাঁর আহ্বান পেয়ে আমি বাগচি জমসেদপুর রওনা হলাম।

বাগচি জমসেদপুরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ডাক্তারবাবু সকলের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুপুরে সেখানে একটি মহিলা সভা হলো। এখানে এই প্রথম মহিলা সভা, সকলেই পর্দানশীন মহিলা। আমি তাঁর সদর ঘরটিতে বসে আমার বক্তব্য বলতে লাগলাম। ঘরের দ্বারটি অর্ধ উন্মুক্ত ছিল অন্দরের দিকে, কিন্তু কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর দেখি দ্বারটি সম্পূর্ণভাবে খুলে গেছে, আমি আবেগ ভরে জননীদের প্রণাম দিলাম। আমি ভাল বক্তা নই এবং কখনও কোন মহিলাসভায় বক্তৃতা দেই নি; জানি না জননীদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম কি না। তবে তাঁদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টার আমি কোন ত্রুটি করি নি।

মহিলাসভা শেষ করার পর স্কুলবাড়ীতে রওনা হলাম। সেখানে একটি খোলা জায়গায় সভা বসলো, কিন্তু লোক বিশেষ আসে নি, বোধ হয় দুশোর কম লোক এসেছিল। ভদ্রলোকেরা আমার এ চাষাড়ে বক্তৃতায় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। যখন শুনলাম বাগচিবাবুরাই এখানকার জমিদার, প্রতি পদক্ষেপেই আমার ভয় হতে লাগলো, যদি আমার বক্তৃতার দ্বারা বাগচিবাবুদের কোন ক্ষতি করে ফেলি। আগে যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা আমায় বললেন, 'আপনার আজকের বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হয় নি।' আমি তাঁদের বললাম, বোধ হয় চাষাদের সভায় চাষাড়ে বক্তৃতা দেওয়া আমার স্বভাব, এতগুলি ভদ্রলোককে দেখে আমার বাক্যস্ফূর্তি হয় নি। পরদিন শিকারপুর ফিরলাম এবং সেখান থেকে ভেড়ামারা রওনা হলাম। বিলাসদার ওখানে এসে আহারাদি সেরে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম।

বিকাল পাঁচটার সময় ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ কংগ্রেস অফিসে পৌঁছুলাম। তথায় ত্রিতলের বারান্দায় বি. পি. সি. সির সভা বসেছে। দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সকলেই আছেন। দেশবন্ধুর পদধূলি নিতেই তিনি স্নেহভরে আলিঙ্গন দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সকলেই একটু কানাঘুষা করতে লাগলেন। মাননীয় শশাঙ্কশেখর গুপ্ত মশাই উচ্চকণ্ঠে সকলকে জানালেন, 'এই আমাদের

সোমেশ্বর চৌধুরী, যিনি দ্বিতীয় নীলদর্পণের সৃষ্টি করেছেন, যে কথা সব খবরের কাগজে প্রচার হচ্ছে।'

সকলেই আনন্দিত হলেন, আমি অবনত শিরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সমীপে প্রণত হলাম। দেশবন্ধুর নিকটে একটি চেয়ারে বসার অনুমতি পেলাম। দেশবন্ধু ও শশাঙ্কবাবু উভয়ে কি আলোচনা করলেন। কিছুক্ষণ পর শশাঙ্কবাবু প্রস্তাব করলেন, 'আমি প্রস্তাব করছি যে, শ্রীমান্ সোমেশ্বর প্রসাদকে বি. পি. সি. সির সভ্য বলে মেনে নেওয়া হোক।' মাননীয় দেশবন্ধু বললেন, 'আমি সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।' অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে আমি বি, পি. সি. সির সভ্য মনোনীত হলাম। সভ্য মনোনীত হওয়ার পর আমি চেয়ার হতে উঠে সকলকে আর একবার কৃতজ্ঞতাসূচক অভিবাদন করলাম। সকলে করতালি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলেন, আমি পুনরায় আসন গ্রহণ করলাম।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য শেষে দেশবন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে ১৭নং ভীম ঘোষ লেনে শ্বশুর মশাইয়ের বাসায় উপস্থিত হলাম। পরদিন সকালে জননীর চরণ দর্শন মানসে পল্লীগ্রামের নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন বাড়ী পৌছুলাম রাত্রি আটটা (তখন মেমারী-মধ্যমগ্রাম বাস সার্ভিসও ছিল না—মেমারী স্টেশন হতে পদব্রজে কিংবা গো-যানে আঠার মাইল রাস্তা যেতে হত) বাড়ীতে আলো নেই—অন্ধকার। জননী সেই অন্ধকারে বারান্দায় শুয়েছিলেন, আমার ডাক শুনে হঠাৎ আমাকে কাছে পেয়ে তিনি আনন্দাতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'বাবা, প্রতিদিন কত কথাই লোকমুখে শুনছি, কেউ বলে সে জেলে গেছে, কেউ বলে সে কি আর আছে? নিজে পাঠিয়ে দিয়ে এখন কেঁদেই বা কি হবে? যা হোক যখন এসেছিস আর কি হবে, গিয়ে কাজ নেই।' মা কাঁদতে লাগলেন। মায়ের পায়ে মাথা রেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম। একটু পরে উঠে মাকে জানালাম, 'যা শুনেছেন সবই সত্যি, কিন্তু এখনও জেলে যাই নি। আপনার পায়ের ধুলো না নিয়ে জেলেও যেতে পারি না। হঠাৎ বড় মন খারাপ হল আপনার জন্য, তাই ছুটে এসেছি।'

মা বললেন, 'আজ কদিন হতেই তোমার চিন্তায় মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, তাই তুমি না এসে আর থাকতে পারো নি।' আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন সকলেই ভেবেছিলেন আমি জেলে আটক পড়েছি, আমাকে দেখে সকলেই খুসী হলেন। দুদিন মায়ের কাছে থেকে তৃতীয় দিনে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতা

ফেরার জন্য তৈরী হয়ে মাকে বুঝালাম, 'আমি যেখানেই থাকি না কেন চিন্তার কারণ নেই। জেলে আমাকে যেতেই হবে। যদি আপনি আমায় যেতে না দেন তবে দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে, জেলও আমায় ছাড়বে না। আপনার আশীর্বাদের জন্যই কাজ সফল হয়েছে কিন্তু এখন না গেলে চিরদিন মুখ লুকিয়ে থাকতে হবে, উভয়দিকেই আত্মগ্লানিকর। আমার মা হয়ে আপনি নিশ্চয় তা কামনা করবেন না।' যা হোক, অবশেষে জননীর নিকট আশীর্বাদ পেলাম বিদায়ও তিনি দিলেন। আঁখিজলে মায়ের বুক ভাসতে দেখে বললাম, 'জেলে যে যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যদিও মামলা চলছে, তবু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী নেই। যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায় সেকথা আলাদা। কান্নাকাটি করবেন না।' কলকাতায় একদিন থেকে পরদিন দার্জিলিং মেলে ঈশ্বরদি এলাম। রাত্রে বিলাসদার আড়তে থেকে পরদিন ধাপাড়ী রওনা হলাম। রাস্তার দু'ধারেই নরনারী বালক-বৃদ্ধ বনিতা আমার কুশল জিজ্ঞাসায় উৎসুক। আমিও সকলের কুশল জানতে ও ধর্মঘটের সংবাদ নিতে নিতে ধাপাড়ী পৌছুলাম।

আমাকে দেখেই ঘনশ্যামদা বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'মাঝপাড়ার নায়েববাবুর জবাব হয়ে গেছে, তাঁর ছেলে সুরেন্দ্র ভট্টাচার্যের দোকানও তুলে দিয়েছে। এদিকের প্রজারা একতাবদ্ধই আছে, তবে আপনি নদীয়া যাওয়ার পরই রাজশাহী হতে বহু সশস্ত্র পুলিশ—গুর্খা, জাঠ প্রতি গ্রামে গ্রামে কুচকাওয়াজ করে গেছে। কোথাও কোনরূপ অত্যাচার হয় নি, এমন কি সৈন্যরাই প্রজাদিকে ঠিক থাকতে বলে গেছে। আজ দশ-বারোদিন হলো সৈন্য উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে ভিতরে ভিতরে দু-একজন মাতব্বর কিছু গোলমাল করছে। সাহেবদের কুঠির অবস্থা অচল হওয়াতে, ঘোড়াগুলি কলকাতা পাঠানো হয়েছে এবং মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে Filer সাহেব গতরাত্রে গো-গাড়ীতে কখন পর্দা ঢাকা মুসলমান বিবিদের মত গোপনে পালিয়েছেন। গাড়ী চালকের অভাবে পূর্ববর্তী ম্যানেজার সাহেবের ঔরসে চাকরাণীর গর্ভজাত যে এক ছেলে ছিল এবং কুঠিতে খানসামার কাজ করতো, সে-ই রাত্রে সাহেবকে গোপালপুর স্টেশনে পৌছে দিয়েছে।'

কুঠির কর্ম ত্যাগ না করায় কয়েকজনকে প্রহার করা হয়েছে শুনলাম। শুনে স্থির থাকতে না পেরে চারদিকে আমার আসার সংবাদ দিলাম। পরামাণিকরা

এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দু-একটি সভাও করলাম, যেটুকু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা সেরে গেল। যেটুকু অত্যাচার ধর্মঘটিদের দ্বারা হয়েছিল তারও মীমাংসা করলাম।

লালপুর থানার দারোগা নুরুল হক মিয়ার সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা জন্মে। কোথাও হতে আসার সময় রাত্রি হলে লালপুর থানাতেই রাত্রে নুরুল হকের বাসায় আশ্রয় নিতাম। তাঁর স্ত্রী আমাকে দাদা বলে সম্ভাষণ করতেন ও দাদার মতই সম্মান দিতেন। দারোগাবাবু পুলিশ কর্মচারী হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতেন না কিন্তু, তাঁর স্ত্রী আমার কাছে কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যা হয়েছিলেন। এই পুলিশ কর্মচারী ও তাঁর স্ত্রী আমাকে যেরূপ সাহায্য করেছিলেন তাও ভুলবার নয়। বহুদিন তাঁদের অন্নজলেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। যখন কেউই আমায় স্থান দিতো না, তখনও লালপুর থানার দারোগা-বাবুর অনুমতি অনুসারে আমার ঐ ভগিনীটি আমাকে অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নদানে তাঁর এই গরীব ভায়ের জীবন রক্ষা করেছেন। তাঁর ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না। আজও শ্রীভগবানের কাছে তাঁদের দীর্ঘজীবন ও সুখ শান্তি প্রার্থনা করে থাকি।

নদীয়া এলাকায় দিবারাত্র পরিশ্রম করে শরীর আমার একরূপ ভেঙ্গে পড়েছিল। তখন কেবল বিশ্রাম লাভের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠতো, কিন্তু বিশ্রাম লাভের কোন উপায় নেই। কাজ এ সময় দ্বিগুণ হয়ে পড়েছে। চারদিক হতে সভায় যোগদানের আহ্বান আসতে লাগলো। শ্রান্ত দেহ বিশ্রাম খুঁজতে লাগলো, সভাসমিতি একরূপ বন্ধ করে দিলাম কিন্তু অন্য জঞ্জাল এসে উপস্থিত। বিচার ও শালিসী নিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ বসাতে বাধ্য হলাম। কোন কোন ব্যাপার থানায় গেলে দারোগাবাবুও মিটিয়ে দিতেন।

হঠাৎ একজন লোক এসে সংবাদ দিল 'আজ আপনার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারার নোটীশ Mr R. N Raied কর্তৃক সই হয়েছে।' আমি রাজেন হালদার, কেদার চক্রবর্তী প্রভৃতিকে ডেকে বললাম, 'ভাই, আমার দিন গুনতির মধ্যে এসে পড়েছে। হালদারদের যে সভায় অর্গানাইজ করতে বলেছিলাম তার কি হল?' রাজেনদা উত্তর দিলেন, 'সবই ঠিক। আপনি হুকুম দিলেই সভার কাজ আরম্ভ করতে পারি।'

একদিন পর সভার ব্যবস্থা করতে বললাম। হালদারেরা সবাই যেন উপস্থিত হন ও নৌকা পিছু একটি করে ইলিশমাছও যেন কংগ্রেসকে দেওয়া হয় এও জানাতে বললাম। রাজেনদা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সভার দিন বেলা নটার সময়ে ক্লান্তদেহে ঘনশ্যামদার গদীঘরের বারান্দায় বসে কার্যতালিকার বিষয়গুলি চিন্তা করছি, এমন সময়ে সেই বটতলার নিকট একটা জিউলিগাছে আংটা লাগিয়ে একখানি সুন্দর নৌকা এসে কিনারায় ভিড়লো। নৌকার ছইএর মধ্য থেকে সাহেববেশী দুজন লোক বেরুলেন। নৌকার বাইরে দুজন সিপাহীও দাঁড়িয়ে ছিল। সকলেই ঘনশ্যামবাবুর আড়তে গিয়ে উঠলো এবং 'ঘনশ্যমবাবু, ঘনশ্যামবাবু' করে ডাক দিতে দিতে গদীঘরে প্রবেশ করল। তারপর বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে অন্দরের দিকে চলল। সাহেবী পোষাকের একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন 'মশাই, সোমেশ্বরবাবু কোথায় ?' দেখলাম আমাকে তো এঁরা কেউই চেনে না। গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলাম, 'কেন তাঁকে কি দরকার ? বলুন, এখনি কি তাঁকে পাবেন ? এত ব্যস্ততার কি কারণ আছে ?' তিনি বললেন, 'একটু ব্যস্ততার কারণ আছে, তিনি কি সাহেব বাজারের সভায় চলে গেছেন ?' আমি জানালাম, 'না তিনি এখনও যান নি, তাঁকে কি গ্রেপ্তার করার জন্য এসেছেন ?'

তিনি—'ঠিক তা না হলেও, কতকটা সেই রকমই বটে।'

আমি—'কিন্তু ভাই ! তাঁর অপরাধ কি ? পুলিশ ও বিচার বিভাগ এই সব অত্যাচার অবগত হয়েও কিছু প্রতিবিধান করেন নি বা করতে পারেন নি। সোমেশ্বরের যদি অপরাধ কিছু হয়ে থাকে তো তা এই যে, তিনি অত্যাচারী সাহেব কোং-এর অত্যাচারকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ভগবানের কৃপায় তিনি এখন তাদের কিছুটা দমন করতে সমর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয়। আপনি বাংলাদেশের ছেলে হয়ে কোন প্রাণে তাকে সাহায্য না করে, সেই মহান্ কাজে বাধার সৃষ্টি করতে এসেছেন ?'

তিনি—'দেখুন, এখানে আর কেউ-ই নেই, বলতে বাধা কি, ব্যক্তিগতভাবে আমিও সোমেশ্বরবাবুর এই আন্দোলনকে সমর্থন করি। আমার দ্বারা যদি কিছু হবার উপায় থাকতো, আমি সোমেশ্বরবাবুকে সকল প্রকার সাহায্য করতাম, কিন্তু আমরা আইনের নাগপাশে আবদ্ধ, আমাদের আন্তরিক সমর্থন থাকলেও মৌখিক কিছু (কর্মের দ্বারা দূরে থাকুক) সাহায্য করবার ক্ষমতাও নেই।'

আমি—"তাঁর প্রতি যাতে অবিচার না হয় ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আপনাদের দেখা উচিত কি না? তার প্রতি অবিচার দেখলে অন্ততঃ প্রতিবাদ করাও উচিত।"

তিনি—"আমাদের প্রতিবাদ নেয় কে? আমাদের পরামর্শই বা নেয় কে? যতক্ষণ আমাদের হাতে ছিল, আমরা কোন কথাই বলি নি, কিন্তু এখন উপর হতে এই Notice দিতে হুকুম হয়েছে, আমরা বাহক মাত্র।"

বাড়ীর ভেতর হতে ঘনশ্যামবাবুর উচ্চ চিৎকার শুনতে পেলাম "কে মশাই আপনি? আমার অন্দরমহলে ঢুকেছেন? কার হুকুমে? আমি মজা দেখাচ্ছি আপনাকে।" ঐ ভদ্রলোক উত্তর দিতে দিতে গদীঘরের মধ্যে আসছেন "মাপ করবেন, আমি না জেনে ঢুকেছি, আমি পাবনার D. S. P. আমি সোমেশ্বরবাবুকে চাই।" ঘনশ্যামদা ছাড়ার পাত্র নন, তিনি বললেন "সোমেশ্বর কি ভাতের হাঁড়িতে বসে আছে, যে আপনি তাঁকে খুঁজতে অন্দর-মহলে ঢুকেছেন? দেখুন কতলোক সাক্ষী, আপনি আমার বিনা অনুমতিতে আমার অন্দরে ঢুকেছেন,—সোমেশ্বর কি ইটপাটকেল? যে এসেই তাকে কুড়িয়ে পাবেন! কোথায় কোন চড়ে আছে তার ঠিক কি?" ঘনশ্যামদা ও কুড়ি পঁচিশ জন লোকের সঙ্গে সেই D. S. P. ভদ্রলোক অপ্রতিভের মত আমার কাছে এসে বসলেন, আমি তখন পূর্বের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বাংলা ও ইংরাজী মিশিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত। D. S. P. ভদ্রলোক ঘনশ্যামদার কাছে ক্ষমা চাইলেন, সত্যই অন্যায় হয়েছে তার এটাও জানালেন।

আমি D. S. P. ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বললাম "এত শিগ্‌গির অন্যায় স্বীকার করলেন? ভাই যদি ভাই-এর বাড়ী না যায় তবে যাবে কোথায়? তবে দুঃখ এই যে, আপনি D. S. P. হয়েও একটা গদীঘরের উঠান পেরিয়ে অন্দরে গিয়েছেন সোমেশ্বরকে খুঁজতে সে কি গোপনে থাকার লোক? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো প্রথমেই সন্ধান দিতাম, যাইহোক তিনি এখনি আসবেন", এই বলে পুনরায় পূর্বের সেই লোকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলাম। তর্কের মধ্যে D. S. P, ভদ্রলোকও যোগ দিলেন এবং শেষে স্বীকার করলেন যে "সোমেশ্বর যে কাজ করলো, (কতদূর কি করতে পারবে তা জানি না) কিন্তু এ অঞ্চলের তিনি যে একটা স্থায়ী উপকার করতে পেরেছেন সে বিষয়ে সকলেই এক মত, এজন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে থাকি, সোমেশ্বরের কথা এদেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এর পর কংগ্রেস ও খিলাফৎ ও হিন্দু মুসলমানের মিলন বিষয়েও বহু প্রকার আলোচনা হলো, আলোচনায় তাঁরা বেশ সন্তুষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর D. S. P. ভদ্রলোক আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি হেসে উত্তর দিলাম "আমার নাম নিয়েই বা কি হবে?"

D. S. P. ভদ্রলোক বললেন "কেন" নাম জিজ্ঞাসা করা কি অন্যায়?"

আমি—"না, নাম জিজ্ঞাসা নিশ্চয় অন্যায় নয়, আমার নাম সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী।" তাঁরা উভয়েই ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, পরে বললেন "আমরা মনে করেছিলাম, এত বড় যাঁর নাম তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞান-বৃদ্ধ-বয়স্ক হবেন। আপনাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বা সোমেশ্বরবাবুর সহকারী ভেবেছিলাম কিন্তু আধ ঘণ্টার আলোচনায় যে মধুরতা ও প্রাণকাড়া ভ্রাতৃভাবের পরিচয় পেলাম, তাতেই আপনাকে পরিচিত করেছে; ছাইচাপা আগুনের মত মলিণ জীর্ণ খদ্দরে আবৃত একটা দেশের বহু লোকের ভালবাসার প্রিয়বস্তু সোমেশ্বর বসে থাকতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত।"

আমি যখন বললাম "আপনারা কেন যে এসেছেন কিছু তো বললেন না এখনও।" লজ্জিত ভাবে পূর্বের ভদ্রলোক পাবনার S. D. O. মহোদয় একটি ১৪৪ ধারার Notice বের করে সই করিয়ে নিলেন এবং আমাকে এক কপি যা নকল দিলেন। আজকের হালদারদের যে সভায় আমার যাওয়ার কথা সেই সভায় যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, নোটীশটি দিয়ে তাঁরা লজ্জিত ভাবে বিদায় নিলেন।

তাঁরা চলে যাবার পর বহুক্ষণ চিন্তা করলাম, কি করা উচিত। আমার আরব্ধ কর্ম এখনও শেষ হয় নি। এই নোটীশ অগ্রাহ্য করলেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। নদীয়ার এলাকা থেকে লোক এসে সংবাদ দিয়ে গেল কতকগুলি লোক এখনও কাজ করছে। যাইহোক আমি হালদারদের সভায় না যাওয়াই উচিত বিবেচনা করে গেলাম না। সন্ধ্যায় লোক এসে সংবাদ দিল "আজ হালদারদের সভায় আপনাকে না পেয়ে সকলেই বড় মর্মাহত হয়েছেন, এত লোক ও এত বেশী নৌকা এসেছিল, কখনও একসঙ্গে এরকম হয় নি। পদ্মার পুলের উত্তর দিক হতে আরম্ভ করে বহুদূর পর্যন্ত পদ্মার জল দেখা যায় নি; কেবলি নৌকা! এক নৌকা হতে অন্য নৌকায় পা দিয়ে পদ্মা পার হওয়া যায়, একটি করে মাছ দিয়ে তারা 'মাছের পাহাড়' জমিয়াছিল।"

যাইহোক ধীবর সমিতির পক্ষ থেকে সেগুলির সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি যে হয়েছিল তা আজও জানি না। ঐ স্থানের ঐ আদায়ী মাছের মূল্য ও আদায়ী চাদার টাকার জন্য আমাকে অনেক কথাই শুনতে হয়েছিল ভবিষ্যতে, এমন কি অনেকে নাকি এও বলতে কুণ্ঠিত হন নি, যে ঐ টাকা আমি আত্মসাৎ করেছি; কিন্তু পুলিশ ও স্থানীয় লোকেরা ভালভাবেই জানেন যে ঐ সভায় আমি যাই নি। ঐ সভায় যোগদান করতে না পারায় আমিও বিশেষ মর্মাহত হয়েছিলাম। কেউ কেউ ভীরু কাপুরুষ আখ্যায় অভিহিত করতেও কুণ্ঠিত হন নি।

এ সময়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তবুও চড় এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। অবসন্ন দেহেও দৈনিক চার পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাটতে হত। দিন ছয় সাত পর একদিন বিকেলে শ্রান্তভাবে লালপুর থানায় গিয়ে উঠলাম ও একগ্লাস জল খেয়ে বারান্দার চেয়ারে বিশ্রাম করছি এমন সময় নূরুল হক দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'খাকিপ্যান্ট পরা কোন লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?" জানালাম "দেখা হয় নি, আর যদিও দেখে থাকি, খেয়াল হয় নি।"

দারোগা—'নিশ্চয়ই দেখা হয় নি, তিনি আজ দুদিন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘুরছেন।' আধঘণ্টা কথোপকথনের পর দেখি দুজন লোক হাঁটু পর্যন্ত ধুলো নিয়ে অতিশয় পরিশ্রান্ত ভাবে থানায় এসে উঠলেন এবং দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন "আজ তিনদিন উত্তীর্ণ প্রায় কিন্তু মজার কাণ্ড যেখানে যাই, সেখানেই শুনি 'এই তো সোমেশ্বরবাবু এখানে ছিলেন, শীঘ্র যান অমুক গ্রামে গিয়েছেন' শুনে আমি সেই গ্রামে গিয়ে ঐ একই কথা শুনি, আজ তিনদিনে চল্লিশ মাইল-এরও বেশী রাস্তা ঘুরলাম কিন্তু সব ঠাঁই ওই একই সংবাদ শুনি, আমি তো হতাশ হয়ে পড়েছি মশাই! এ লোকটা কি রকম? বিরাম বা বিশ্রাম নেই, আমি তার পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

দারোগাবাবু বললেন "এ রকম না হলে কি এই অল্পদিনে মিডনাপুর জমিদারী কোং-এর সাহেবদের জব্দ করতে পারতো মশাই! তিনদিনেই তাকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব বলছেন কিন্তু সাহেবরা স্বীকার করেছেন Mysterious man-এর কাজের চিহ্ন পাওয়া যায় কিন্তু মানুষটার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, মাসের পর মাস তারা ঘুরছে কিন্তু খুব অল্পই পেয়েছে সোমেশ্বরের দেখা।" এই বলে

দারোগাবাবু উঠে চলে গেলেন। নবাগত ব্যক্তি দুজন বারান্দায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন ও নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন "আমি বহুদিন হতে C. I. D.-তে চাকরি করছি কিন্তু এমন দেখি নি। সত্যই—এ অঞ্চলের লোকেরা সোমেশ্বরকে ছেলের মতই ভালবাসে।" খাঁকিপ্যান্ট পরা ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি সোমেশ্বরকে দেখেছেন কি ?"

আমি—"হাঁ দেখেছি, কিন্তু কি জন্য তাঁকে খুজছেন ?"

তিনি—"একটি ১৪৪ ধারার নোটীশ আছে তার নামে।" "সেটা কি আমায় দেখাতে পারেন ?" জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আপত্তি আর কি, এই দেখুন।" সেটা পড়ে দেখলাম, রাজসাহী জেলার কোথাও কোন মিটিং করা নিষেধ। এই সময়ে দারোগাবাবু তাঁর কোয়ার্টারের দরজা হতে ডাক দিলেন—"সোমেশ্বরবাবু, আসুন, জল খাবেন।" ভদ্রলোক দুইজন আমার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন "আপনি ?"

আমি—"আজ্ঞে হাঁ, এই অধমই, যদি অনুমতি করেন তবে নোটীশটি সই করে নিতে পারি।" উত্তর পেলাম—"নিশ্চয়ই, এ তো আপনারই।" যা হোক জলযোগ করে ফিরে এসে নোটীশ সই করে নিলাম। তারা সশ্রদ্ধ অভিবাদন করলেন, আমিও প্রত্যাভিবাদন করে অন্যত্র যাবার জন্য রওনা হলাম। আসার সময় তাদের বললাম "আমি যদি সভা না করি তবে তো আর গ্রেপ্তার করবেন না।" তাঁরা উত্তর দিলেন, "নোটীশ মেনে চললে তো আর আপনাকে ধরা চলে না, তবে মশাই আপনাকে ধরা না ধরা সবই ঐ ওপরওয়ালা বড়কর্তাদের ওপর নির্ভর করে, আমরা সামান্য কর্মচারী মাত্র।" এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হলো না, আমি তখন আর কোন সভা করতাম না, পথে পথেই ঘুরে বেড়াতাম এবং সকলকে দৃঢ় থাকতে অনুরোধ করতাম। আমার মনে হয় তাতেই যথেষ্ট কাজ হতো ?

সাতটি দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াবার পর বোধহয় এদের রিপোর্ট গেল 'সভা নিষেধ করাতে সোমেশ্বরের কোন ক্ষতি হয় নি।'

একদিন বিকেলে বাথানবাড়ী গিয়ে শুনলাম মাঝের চড়ের পাঞ্জা পরামানিক সাহেবদের হয়ে, প্রজাদের বিরুদ্ধে সকল রকম অত্যাচার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। কেউই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে নি। পাঞ্জা পরামানিক একজন দুর্ধর্ষ লোক। সকলে তাকে যমের মত ভয় করে। তার ডাকে বহু লাঠিয়াল বার

হয়ে থাকে। তার লাঠির জোরেই সাহেবরা অনেক শত্রুকে দমন করে নিয়েছেন। নীরবে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম, মনে হলো ১৪৪ ধারার কথা, বেশীদিন বোধহয় আমাকে বাইরে থাকতে দেবে না সরকার, এটা সুনিশ্চিত। আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

আমি জানালাম' 'একবার পাঙ্গা পরামানিকের বাড়ী যেতে চাই, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে যাবে না?" আমার কথায় উপস্থিত সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং জানালো "না, সে যমের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, সেখানে থানা পুলিশ কিছুই নেই, চারিদিকে পদ্মা দিয়ে ঘেরা একটা দুর্গ বিশেষ, তার হর্তা কর্তা বিধাতা সবই ওই পাঙ্গা পরামানিক, সেখানে যদি দশ বিশটা খুনও কেউ করে কিম্বা জীবন্ত সমাধি দেয়, তবু তার বিরুদ্ধে কথা বলার একটিও লোক নেই, কাক পক্ষীও টের পাবে না কি হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউই তার হাত হতে নিস্তার পায় নি, বোধহয় খোদারও হুকুম চলে না পাঙ্গা পরামনিকের ওপর। সাহেবের হুকুম মাত্রই সে ও তার অনুচরেরা সহস্র অন্যায় করে থাকে, এমনকি পরিণাম চিন্তাও করে না। সে 'নররাক্ষস', তার গহ্বরে যাওয়ার কোন দরকার নেই।"

আমার আগ্রহ ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে অবশেষে ঘুঘুর পরামানিক সঙ্গে যেতে রাজী হলো, সকলে নীরব রইল। ঘুঘুরের মেয়ের সঙ্গে পাঙ্গার একটি ছেলের বিয়ে হয়েছে, উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ। বাথানবাড়ী হতে 'পাঙ্গার চড' সাত আট মাইল দূর। ঠিক সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা 'পাঙ্গার চড়' উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অল্পক্ষণ পরেই হাসিমুখে চন্দ্রদেবী উদিত হলেন, শুভ্র চন্দ্র কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠলো। আমরা উভয়ে প্রাণপনে হেঁটে চলেছি। এই চড় অঞ্চলে কেবলি গগনস্পর্শী ঝাউবন, এই ঝাউবনে বন্য বরাহের বরই উপদ্রব। সামনে লাঠি হাতে ঘুঘুর পরামানিক, তার পিছনে আমি। নৌকায় প্রথম পদ্মা পার হয়ে পাশের চড়ে প্রবেশ করলাম। আমরা যখন নৌকা হতে নামলাম তখন প্রায় রাত্রি আটটা, হাঁটতে শুরু করলাম। আবার পাশের চড় পার হয়ে যখন দ্বিতীয় পদ্মা পার হলাম তখন রাত্রি প্রায় নটা, আমরা মাঝের চড়ে বা পাঙ্গার চড়ে প্রবেশ করলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর দেখলাম দূরে জ্যোৎস্নাধৌত শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে স্তিমিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি কাঁচাঘর। সেখানকার মাটির ঘরগুলির দেওয়াল স্থানীয় পলিমাটির দ্বারাই লেপা হয়েছে, শুভ্রতায়

সেগুলি আধুনিক পঙ্কের কাজকেও লজ্জা দেয়। সেই গভীর রাত্রিতে পাঙ্গার ভীষণতার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে, ঐ ঘরগুলি যেন ঘুমন্ত দৈত্য পুরীর মত বলেই মনে হতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ঘুগুরকে জিজ্ঞাসা করেছি ঐ বাড়ীগুলি কোন্ গ্রামের? ঘুগুর একবার ভাল করে চারিদিকে চেয়ে জানালো "ঐ তো পাঙ্গার বাড়ী।" সেখান হতে তিন চার রশি দূরে গিয়ে আমরা পাঙ্গার বাড়ী পৌছুলাম। একটা মহা আতঙ্কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা সবলে ছ্যাঁত করে দোল দিয়ে উঠলো। মেষশাবক সিংহ গহ্বরে চলেছে! মনের মধ্যে কত চিন্তা খেলতে লাগলো, যদি আজ এইখানে 'সবশেষ' হয়? যদি পাঙ্গা কোন অনুরোধ না রাখে, যদি সঙ্কল্প না ভাঙ্গে ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে পাঙ্গার খানকার সামনে এসে হাজির হলাম। মনের মধ্যে ভয় তখনও পাখা মেলে বসে আছে।

স্তব্ধ রাত্রি, চারদিক্ হতে যেন একটা 'ঝুম ঝুম্' আওয়াজ মনের কোণে ধ্বনিত হতে লাগলো—যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানব শূন্য শস্য ক্ষেত্র ও অভ্রভেদী ঝাউবন। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুচারটি ঐ মাটীর বাড়ী ও ঘর দেখা যায়, তাও ঐ পাঙ্গার অনুচর বৃন্দের। স্থানটির চতুর্দিক ঘিরে ভীষণা পদ্মা নেচে নেচে চলেছে। ধূসর চন্দ্রালোকে কপোত পাতের মত পদ্মাকে আংশিকভাবে দেখা যাচ্ছে। সবার ওপর সেখানকার ঘুম পাড়ানী হাওয়া! ঝাউয়ের শীর্ষদেশে চন্দ্র কিরণের সঙ্গে বাতাসের অপূর্ব খেলায়, এক অনির্বচনীয়ভাবে অভিভূত করে প্রাণে কি যেন এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। পাঙ্গার খানকার দাওয়া খুবই উঁচু, প্রাঙ্গনে দাঁড়ালে আমার কাঁধের উপর পর্যন্ত দাওয়ার কিনারা। সেই সুউচ্চ দাওয়ার উপরে একটি মাদুরে শয়ান একটি সুদীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি, আপাদ মস্তক শুভ্রচাদরে ঢেকে নিশ্চিন্ত মনে সিংহের ন্যায় নাক ডাকিয়ে নিদ্রাগত। এ যেন প্রকৃতি মায়ের কোলে তাঁর ক্লান্ত সন্তান শ্রান্তিদূর করছে।

নিম্নকণ্ঠে ঘুগুর পরামানিক বলল "এই পাঙ্গা, দেখছেন কিরকম মরদ, লম্বা সওয়া পাঁচ হাত! আমরা উভয়ে দাওয়ার ওপর এসে নিঃশব্দে বসলাম, ঘুগুর মাথার কাছে আমি পাঙ্গার পায়ের দিকে বসলাম; তার সিংহের ন্যায় নাসিকা ধ্বনি ও বায়ুভরে দূরাগত জলকল্লোল একত্রে মিলে মুহূর্তের মধ্যে আমার প্রাণে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করলো। অন্তর্যামী যেন আমার ভয় দেখে অন্তরের মধ্যে অভয় দিলেন 'কোন চিন্তা নেই, প্রাণতো একদিন যাবেই, তবে এত ভয় কিসের?'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে পরে ঘুগুরকে বললাম "কই তুমি তোমার জামাইকে ডাকলে না? ডাকো একবার!"

জলদ গম্ভীরস্বরে আওয়াজ হল "কে কথা কয়?" বলতে বলতে এক বলিষ্ঠ যুবা এসে আমাদের সামনে হাজির হলো, পরে ঘুগুরকে সেলাম দিয়ে তার বাড়ীর কুশলপ্রশ্ন করলো। ঘুগুর দাওয়া হতে উঠানে নেমে, তাকে আমার আগমন বার্তা জানালো। যুবা আনতভাবে আমাকে সেলাম দিল, আমি তাকে আশীর্বাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "হ্যা বাবা, সারাদেশের লোকের বিরুদ্ধে কি তোমাদের দাঁড়ানো উচিত?"

যুবা—"আমরা তো বাপজানকে তাই বলি, কিন্তু উনি না শুনলে আমরা কি করতে পারি বলুন?" আমাদের এই কথা বার্তার আওয়াজে পাঞ্জার নিদ্রা ভঙ্গ হলো, এবং উঠে বসতেই পাঞ্জা আমায় দেখতে পেল, ক্ষুদ্র মেষ শাবকের মত পদ প্রান্তে বসে আছি আমি। চোখ দুটি রগড়ে নিয়ে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো "এত রাতে কে?"

মৃদু কণ্ঠে আমি উত্তর দিলাম—"আমি সোমেশ্বর।" বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত থেকে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসে পাঞ্জা বললো "এ কি সম্ভব! স্বেচ্ছায় সোমেশ্বর তার শত্রুর ঘরে গহীনরাতে এসে পড়বে, আমিতো বিশ্বাস করতে পারছি না, করিও না।" আমি বললাম "বিশ্বাস কর ভাই, আমি আজ তোমার চরণ তলে এসেছি, বিশ্বাস না হয় তোমার বেয়াইকে জিজ্ঞাসা করো।"

পাঞ্জা—"জিজ্ঞাসার দরকার নেই, কিন্তু ধন্য আপনার সাহস?"

আমি—"কিসের সাহস পরামানিক? বড় ভাইয়ের বাড়ী এসেছি, তাতে সাহসের কি দরকার? তবে এই বন জঙ্গলে, বন শুয়ারের ভয় না করে পদ্মা পার হয়ে, এতরাত্রে আসা; যদি মনে করে থাকো যে 'সোমেশ্বরকে খুন করতে পারে পাঞ্জা' এটা জেনেও কোন্ সাহসে এসেছি, তাতে ভয় কেন করবো ভাই! মুসলমান যখন তুমি, তখন নিশ্চয়ই তক্দিরকে নিশ্চয় মানো। খোদার ইচ্ছায় আমার তক্দিরে যদি তা না থাকে, তবে একপাঞ্জা কেন, শত পাঞ্জাতে কিছু করতে পারবে না। মৃত্যু ভয় আমার নেই, মৃত্যু ভয় থাকলে এই চড় এলাকায় ঘুরে বেড়াতাম না। মান, ইজ্জত, ভয় সবই আমি দশের চরণে ফেলে দিয়েছি, তারা যা খুশী তাই করতে পারে, সে হিসাবে তুমিও যা খুশী তাই করতে পারো, কিন্তু

আজ আমার এই জীবনের বিনিময়েও যদি পাঙ্গা পরামানিকের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি নিতে পারি তাহলে মরণেও শান্তি পাবো।"

পাঙ্গা—"লোক মুখে শুনি সোমেশ্বর পরকে আপন করে নিতে পারে' এটা শোনা কথা ছিল, আজ তা মালুম হচ্ছে, তবু আবার সাবাস দিচ্ছি এই গহীনরাতে শত্রু পুরীতে কোন্ সাহসে এলেন ?"

আমি—"শত্রু তুমি নও ভাই ? তুমি আমার বড ভাই ! এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ের নিভৃতে দৃঢ়ভাবে আছে বলেই আমি তোমার বাড়ী আসতে সাহস পেয়েছি। এখন ওসব ছেড়ে দাও, আমার সময় বড় অল্প। একপা জেলে এক পা বাইরে।. তুমি আমার চাইতে বয়সে অনেক বড, আমি এই তোমার পায়ে ধরছি, তুমি একবার বল 'দেশের আর দশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না বা অত্যাচার করবে না, লাঠি ধরবে না।'

আমি পাঙ্গার পা দুটি দুহাতে চেপে ধরা মাত্র "করেন কি, করেন কি ?" বলে পাঙ্গা পা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করল "ধন্য আপনার বাহাদুরী ! এই কঠিন প্রাণটাকেও গলিয়ে দিলেন ? কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। আমার মুখের কথাতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন কি করে ? আমি যে মিথ্যা বলবো না তারই বা প্রমাণ কি ?"

আমি—"আমি জানি, পাঙ্গা বেইমান নয় ! পাঙ্গার মুখের কথাই যথেষ্ট।"

পাঙ্গা বলে উঠলো—"ঠিকই বলেছেন বাবু ! পাঙ্গা বেইমান নয়, আর নিমক হারামও নয়। এই যে আপনার চোখের সামনে শস্যভরা খেতগুলো দেখছেন এ সবই সাহেবদের দান ! এর জন্য একটি পয়সাও সাহেব সরকারকে কখনও দিই নি, বিনিময়ে কথা দিয়েছি দরকার হলে জান দিয়ে উপকার করবো। বলুন, যে মুখের কথা আপনি চান সেই মুখের কথা যে আগেই সাহেবদের দিয়ে রেখেছি, কি করে সে কথার বাইরে যাই ?"

আমি—"সারাদেশের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতে ও মিথ্যে সাক্ষী দিতে বা ঘর জ্বালাতে তো কথা দাও নি।"

পাঙ্গা—'যার নিমক এতদিন খেয়েছি, কি করে তার এই বিপদের দিনে সরে দাঁড়াই ? আমার মান সম্মান, প্রতিপত্তি সবই ঐ সাহেবদের দয়ায়। আজ কি করে উপকারীর অপকার করি বা আদেশ অমান্য করি।"

আমি—"দশ যেখানে ধর্মও সেখানে, আমি আবার তোমার পায়ে ধরছি,

অনুরোধ করছি তুমি ক্ষান্ত হও! (এবার আর পা দুটি ছাড়লাম না) খোদার কাছে জবাব দিহি তোমাকেই দিতে হবে! হাজার প্রজার স্বার্থ রক্ষা করা উচিত না সাহেবদের অযথা অত্যাচার বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত?"

পাঙ্গা—"সব বুঝি, দশের বিরুদ্ধে গেলে খোদা নারাজ হন, তবু উপায় নেই, আমার পায়ে ধরে কোন লাভ নেই, আমার কাছে কোন প্রতিশ্রুতিই পাবেন না, আমি সাহেবদের কথামত কাজই করবো, আপনি আমাকে বাদ দেন।"

কৌশলে সিংহকে নখদন্তহীন করাই একমাত্র উপায় ভেবে বললাম "আচ্ছা নিজে যা খুসী করো কিন্তু অন্যকে দশের বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাইবে না।" ঠিক এই সময়ে পাঙ্গার আট পুত্র দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে। পাঙ্গার প্রত্যেক পুত্রই পাঙ্গার দ্বিতীয় সংস্করণ, এক একটি অসুর অবতার। এই পাঙ্গারা যখন লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ায় যমও বোধ হয় তখন ভয় পায়। চাঁদের আলোয় তাদের সুগঠিত শ্যাম দেহ কয়খানি বার বার দেখে মনে হতে লাগলো, যেন কয়খানি 'শালবৃক্ষ' দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি ভয়াল অথচ মনোরম দৃশ্য! আমি পাঙ্গার ছেলেদের সম্বোধন করে বললাম "বাপ সকল! তোমরা তো সবই শুনলে এবং সবই জানো, এ অবস্থায় তোমরা প্রতিজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হবে না নিশ্চয়।"

পাঙ্গার এক ছেলে বললো "হুজুর! আমরা তো আজ বহুদিন ধরেই বাপজানকে বলছি, দশের বিরুদ্ধে কিছু করে কাজ নেই, কিন্তু কি করবো ওঁর মতই ভিন্ন, আপনিও তো দেখছেন, বাপজানকে টলানো কত কঠিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ থেকে দশের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবো না কিম্বা কোন অন্যায় কাজ করবো না।" একে একে পাঙ্গার আটটি ছেলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। পাঙ্গা তাই দেখে আমাকে বলে উঠলো—"আমার বুকের ওপর বসে, আমার সমস্ত বাহুবলগুলিকে হাত করে নিয়ে, আমাকে একেবারে 'নুলো' করে দিলেন।"

আমি—"না ভাই! তোমার ছেলেরা দশের ও ধর্মের জন্যই তাদের পিতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলো, এদের কোন দোষ নেই, এটা পুণ্য কাজ।"

পুত্রদের সঙ্গে পাঙ্গার বচসা হলো। পিতার উপযুক্ত পুত্রগণ, তেজস্বিতায় পিতা অপেক্ষা কম নয়, উত্তেজিতভাবে তারা বলে উঠলো "আমরা কথা দিচ্ছি বাবু আপনি যান, আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করবো, যাতে করে বাপজান আর এই ধর্মঘট না ভাঙ্গতে পারেন, উনি একা কি করতে পারেন।" আমি তাদের সকলকে আশীর্বাদ দিলাম ও পাঙ্গাকে আলিঙ্গন দিয়ে দুঃখিত হতে নিষেধ

করলাম। যখন এই সব শেষ হল, তখন রাত্রি বোধ হয় দুটো বেজে গেছে। কেবলি ঘুমে চোখ বুঝে আসছিল। পাঙ্গা আমাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো; সেই রাতেও দুধ চিঁড়া খেয়ে খান্কার দাওয়ায় শুয়ে পড়লাম, ঘুগুর পরামাণিকও শুয়ে পড়লো। চন্দ্রালোকস্নাত মুক্ত বায়ুহিল্লোলে, শ্রান্তি কোথায় চলে গেল, অল্পক্ষণমধ্যেই ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম। প্রভাত সমীরের স্নিগ্ধ স্পর্শে যখন জেগে উঠলাম তখন পাঙ্গা ও তার পুত্রদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করতে শুনলাম। ঘুগুর ক্লান্ত ছিল, তার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নি। যাইহোক মুখ হাত ধুয়ে মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব শ্যাম শোভা তন্ময় হয়ে দেখছি, এমন সময় মনে হলো, দূরে ছোট ছোট ঝাউগাছের মধ্য দিয়ে কি সব ট্রেন ছুটে আসছে, সেজন্য ঝাউগাছগুলিও সঞ্চালিত হচ্ছে মনে হলো। সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেউ বললে বন শূয়ারের দল মারামারি করছে।

আমার কিন্তু মনে হলো, কে যেন প্রাণের মধ্যে ডাক দিচ্ছে, অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে পুনরায় আলাপে যোগ দিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর দেখি, আমার অনুমানই সত্য? একজন আমার কাছে এসে হাজির হলো, সে বাথান বাড়ীর খুশী পরামানিক। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলো "অনেকগুলি ফৌজ নিয়ে, কাল রাত্রে (বাথান বাড়ীতে) লালপুর থানার দারোগা গ্রেপ্তার করার জন্য হাজির হয়েছিলেন, আপনি এখানে চলে আসার পর। অনেককিছু জিজ্ঞাসাবাদও করেন। যখন জানতে পারলেন আপনি পাঙ্গার চড়ে এসেছেন তখন সদলবলে আপনার অনুসরণ করেন খোদাকে ধন্যবাদ! আপনি জেদ করে না চলে এলে কাল রাতের বেলাতেই আমাদের কাছ থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। ঘন্টা খানেক পরই দারোগাবাবু ফিরে এলেন দলবল নিয়ে, বললেন 'এত সহজে কি সোমেশ্বর বাবুকে ধরা যায়, কাল সকালে গিয়ে গ্রেপ্তার করবো।' এই বলে তিনি লালপুর থানায় ফিরে গেছেন। আমরা যুক্তি করলাম আপনাকে আগে সংবাদ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া; সকলের অনুরোধ নিয়েই এসেছি। আসার পথে মনে হলো যেন দূরে ফৌজ আসছে। আপনি এখনি সরে যান।"

আমি—"এখান থেকে কোথায় যাবো ভাই! কে আশ্রয় দেবে? এতো সাহেবদের কথা নয় বৃটিশ গভর্নমেন্টের কথা। সারা ভারতেই তারা আমায় খুঁজবে, তবে সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার এড়ানো যেতে পারে, পালিয়ে

গিয়ে শত্রু পক্ষের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করা হবে শুধু, আমি কোথাও যাবো না।"

আমার কথাশুনে পাঞ্জা বিচলিত হয়ে উঠলো এবং আমাকে বললো "তা হয় না বাবু! পাঞ্জার বাড়ী হতে তার সামনেই পুলিশ এসে আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনি শত্রু হলেও সে অপমান পাঞ্জা সইতে পারবে না। আমি নির্বিঘ্নে আপনাকে এখনি নদীয়ার এলাকায় রায়টা পাঠাবো। আপনি যদি রায়টা যেতে না চান, তবে এখানে পুলিশের সঙ্গে বিরোধ বাধবে, কি লাভ হবে তাতে? আমার এই চড়ের রাজ্যে একমাত্র সাহেব সরকারদেরই মানি, বৃটিশ ফিটিশ কাউকে মানি না। আমার এই চড় হতে আজ পর্যন্ত কাউকে নিয়ে যেতে পারে নি; আজ আপনাকে নিয়ে যাবে তা সহ্য করবো না। যান আপনি, আপনাকে যেতেই হবে।"

পাঞ্জার পুত্রগণও অনুরোধ করলো, তাদের চোখেও জল দেখলাম। ভাবলাম ভগবানের ইচ্ছা নয় আজই আমাকে শৃঙ্খলিত করা। গ্রেপ্তার হলে আমার অসমাপ্ত কর্মের এইখানেই যবনিকাপাত হবে। ভয়াল দেশদ্রোহী পাঞ্জার অন্তরে এতদূর মহত্ত্ব এলো কোথা হতে? সবই সেই চক্রীর চক্র!

পাঞ্জার অন্দর হতে সংবাদ এলো—না খেয়ে গৃহস্থ বাড়ী হতে গেলে অমঙ্গল হবে, তাছাড়া কি খাওয়া হবে ঠিক নেই, গরম দুধ বাবুকে খাইয়ে দাও। পাঞ্জা আমায় বললো, "সোমেশ্বরবাবু! কয় ঘণ্টার মধ্যেই আপনি আমায় হাত পাকাটা কন্দ কাটায় পরিণত করে দিলেন, আমার স্ত্রী পুত্ররা সবাই আপনার দলে। আজকের এই ঘটনায় আমার মনটাও দুলছে! আজ যদি পুলিশ আমার বাড়ী হতে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে আমাকেও তাহলে আপনি কিনে রেখে যাবেন, কিন্তু এ জীবনে একমাত্র সাহেবদের হুকুম তামিল করেছি, আর কারো গোলামী এ বান্দা করবে না! আমার বাড়ী হতে আপনাকে যেতে হবে এখনি, নচেৎ আপনাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করলে আমি সুখীই হতাম।" পাঞ্জার স্ত্রী দুধ নিয়ে এলো, পান করে সবাইকে সেলাম জানিয়ে সবাকার কাছেই বিদায় নিলাম, পাঞ্জার স্ত্রী ও পাঞ্জা আশীর্বাদ দিল। যাত্রাকালে বললে, "এটা ভুলবেন না বাবু! যতক্ষণ আপনি আমার এলাকায় আছেন ততক্ষণ আমি আপনার রক্ষক, আমার এলাকার বাইরে গেলেই আমি আপনার ঘোর শত্রু।" পাঞ্জার ছেলেরা আমাকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। শেষে ঘুগুর পরমানিকও পাঞ্জার একটি

ছেলে আমার সঙ্গে রইল। রাস্তায় এসে চলতে চলতে ঘুগুর ও পাঙ্গার পুত্র আমায় জানালো, পাঙ্গাপরামানিক শেষে যে কথা কটি বলেছেন, তা কোন দিন ভুলবেন না, পাঙ্গা আপনার ঘোর শত্রু! যদিও আমরা আছি, দেখবো, তবুও আপনি বুঝে চলবেন।

আমরা যখন পদ্মার কিনারে এসে পৌছুলাম, কিনারা ছেড়ে পাটনী তখন মাত্র পনের ষোল হাত জলে গেছে। পাঙ্গা পুত্র 'বন্দেমাতরম্।' 'গান্ধী জয়'! ধ্বনি করে মাঝিকে ডেকে বললো "ওরে জগবন্ধু! তোর আজ বরাত ভালো, সোমেশ্বরবাবু এসেছেন, তোর নৌকায় নদী পার হবেন, ফিরে আয়! জগবন্ধু মাঝি নৌকা তীরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, কাঁদতে কাঁদতে জগবন্ধু নালিশ জানালো "হুজুর! আমি 'চার আনির' প্রজা, কিন্তু সাহেবরা জোর করে তাদের লোকজন ঘোরা পারাপার করিয়ে নেয় বেগারে, আমার একটা বিহিত না করলে আপনাকে পার করবো না।"

জগবন্ধুকে আদর করলাম, সান্ত্বনাও দিলাম, "যাও আজ থেকে গান্ধীজীর হুকুম ও আমার হুকুম, বিনা পয়সায় কাজ করবে না, প্রাণ গেলেও না, পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।" পাঙ্গারপুত্রকে বললাম, জগবন্ধুকে রক্ষা করার ভার তোমার, সেও রাজী হল। নৌকা পার হয়ে নদীয়ার এলাকায় এসে পৌছুলাম। এদিকে এসে দেখি এদিকে লোকেরা নীলকুঠির কাজ করে চলছে। আমি ঠোঁটার পাড়া গ্রামে নিয়ামতউল্লার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। নিয়ামত সরকার আমাকে ছোট ভাই এর মত স্নেহ করেন। নিয়ামত উল্লা একজন মাতব্বর লোক—এই 'ঠোঁটার পাড়া' গ্রামটা গবর্ণমেণ্টের খাস এলাকাধীন, সে হিসাবে নিয়ামত উল্লা সাহেব কোং প্রজা নয়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় আমি সকাল বিকাল ও রাত্রে তিনবার করে সভার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। যে দুই চার জন সাহেবদের হাতে ছিল তারাও এসে ধর্মঘটে যোগ দিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার দেহ তখন ভগ্ন প্রায়, বিশ্রাম পাবার জন্য প্রাণও সুযোগ খুঁজতে লাগলো, সেজন্য মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। নদীয়াতেও দেখলাম 'কাইয়ামারি', 'কাতলমারি', 'বরিগীর চড়', 'দিলিপনগর' সকল গ্রামেই প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলের একজন পরামানিকের (নাম এখন মনে পড়ছে না) দুশো তিনশো গাড়ী আছে। সেই গাড়ীগুলির লোকেরা তখনও সাহেবদের কাজ করছে, কারুর কোন কথা শোনে না বা ঐ

পরামানিককেও মানে না। বেলা বারোটার সময়ে নিয়ামত সরকারকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মার চড়ের গরমবালুর ওপর দিয়ে হেঁটে উক্ত পরামানিকের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম, বেলা তখন দুটো। এই দুপুরে প্রখর রোদে আমাদের দেখে সে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, "আপনাদের কি দিবারাত্র বিশ্রাম নেই?" আমি বললাম, "ভাইসব! আপনারা কি আমায় বিশ্রাম করতে দিচ্ছেন? এই দেখুন অমুক পরামানিক বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু এমন অবুঝের মত কাজ করছেন যে এই রোদকে তুচ্ছ করে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে।" সকলেই সেই অমুক পরামানিককে একবাক্যে নিন্দা করতে লাগলো, এ কাজ ভাল হয় নি বলতে লাগলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থেকে আলোচনা চললো এবং গাড়ীগুলি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এখান হতে আমরা ঠোঁটের পাড়া যাওয়া ঠিক করলাম। রাত্রি আটটার সময় সামান্য একটু বৃষ্টি হলো, সেই বৃষ্টির পর আমরা বেরুলাম। রাত্রি দশটার সময় তিনক্রোশ দূরে একটি সভা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে গেলাম এবং সভাশেষে রাত্রি দেড়টার সময় নিয়ামতদার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে হাজির হলাম, চিড়া-দুধ-গুড় খেয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে স্বপ্ন দেখলাম, কে যেন মাথার শিয়রে এসে বসে আমায় বলছেন 'এখনও ঘুম ভাঙ্গলো না? তুমি ক্লান্ত তাই তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি। ওঠ, দেখ কে তোমায় ডাকছে!' আমি মোহ মুগ্ধ চোখে স্বপ্ন দেখা দেবীকে দেখার জন্য চোখ খুলতেই দেখি যে আমার সামনে একটি চেয়ারে বসে লালপুর থানার দারোগা।

আমাকে জাগতে দেখে দারোগাবাবু সেলাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, 'উঠে আগে মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, সব পরে বলছি।" থানকার সামনের উঠানের দিকে চেয়ে দেখি যে দুটি বড় বড় ঘোড়ায় সাহেব কোং বরকন্দাজের পোষাক পরা দুজন, একজন স্থানীয় চৌকিদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে চোখা চোখি হতেই তারাও সেলাম জানালো।

আমি নূরুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন এসেছ ভাই? আমার ভগ্নির কুশল তো?" নূরুল হক্ বললেন, "মুখ হাত ধুয়ে আসুন। সব জানাচ্ছি।' ক্ষণকাল মধ্যেই নিয়ামতভাই ত্রস্তপদে এসে পড়লেন বাড়ীর ভিতর হতে। আমি নূরুল হককে বললাম, "যা জানাবার তাড়াতাড়ি বলুন, কারণ দেরী হলে অসুবিধা হতে পারে আপনার।"

নূরুল হক গ্রেপ্তার পরওয়ানাটি দেখিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। আমি পরোয়ানাটি দেখে বললাম, "এ কি বিচার! ওয়ারেণ্ট হচ্ছে রাজসাহীর শাসক R. N Reed এর স্বাক্ষরিত, রয়েছি নদীয়ার এলাকায়; আমি এ ওয়ারেণ্ট মানতে বাধ্য নই। নদীয়ার শাসকের সইযুক্ত ওয়ারেণ্ট ব্যতীত এ ওয়ারেণ্ট মানবো কেন?" নিয়ামত উল্লা নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এই বেআইনী ওয়ারেণ্টের বিষয় জেনে বললো—"তা হবে না মশাই! আপনি ফিরে যান এবং নদীয়া থেকে পুলিশ ওয়ারেণ্ট আনুন, তবে সোমেশ্বরবাবুকে ছেড়ে দেবো নচেৎ নয়। আপনি চাইছেন বেআইনি গ্রেপ্তার, সাহস তো আপনার কম নয়।" দারোগা উত্তর দিলেন, "ভাই! আমরা পরের গোলাম, যেমন হুকুম হয়, সেইরকম মানতে বাধ্য।"

আমি একটু আশ্চর্য ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ভাই এ কি হুকুম! আমার মত গরীবের বেলাতেই কেউ কিছু বলতে নেই বলেই এতদূর অবিচার ও বেআইনি কাজ করতে সাহস করছেন?"

নূরুলহক্—"সোমেশ্বরবাবু! আমি যতটা জানি তাতে ব্যাপারটি তার উল্টো। গবর্ণমেণ্টও বোধ হয় ভয় করেন, আপনার কর্মস্থলটির একটি প্রাকৃতিক গোল আছে, সেটি এই যে রাজসাহী পাবনা ও মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলার সঙ্গমস্থানে আপনি আছেন এবং চারটি জেলার যে কোন একটি হতে অপর এলাকায় চলে গিয়ে আইনকে ফাঁকি দিতে পারেন। আইন ফাঁকি দিয়ে গ্রেপ্তার এড়ানো খুবই সহজ ব্যাপার। আপনি যদি কোনরূপ ফন্দিবাজী করেন তবে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আরও দশ পনের দিন লাগবে, অথচ গভর্ণমেণ্ট—আপনাকে আর একটি দিনও বাইরে রাখতে রাজী নয়, এ অবস্থায় যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে।" আমি বললাম "এইজন্য বুঝি বেআইনী ব্যবস্থা হলো?"

দারোগা—"হাঁ, দেখতে বেআইনী বটে কিন্তু কাগজে কলমে সব ঠিক হয়ে যাবে, বেআইনী থাকবে না।"

আমি—"এ কিরূপে সম্ভব?"

দারোগা—"সোমেশ্বরবাবু! আমি বোঝালে তবে আপনি বুঝবেন? প্রয়োজন হলে কি আইনকে ঘুইয়ে দেওয়া যায় না? শুনুন তবে, আমার উপর হুকুম হয়েছে আমি যেন আপনাকে গ্রেপ্তার করি, ইত্যবসরে আইন বাঁচাবার জন্য তিনটি জেলা

অফিসেই আপনাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা সই করে পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাফ করেছেন Mr. Reed, যে জেলাতেই আপনাকে গ্রেপ্তার করি ন, কেন কাগজে কলমে সেইখানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দেখানো হবে, পরোয়ানাগুলি ডাকযোগে রাজশাহ তে প্রেরিত হবে। উপরওয়ালার হুকুম মত, একটা ওয়ারেণ্ট ফাইলে থাকবে ও স্টেশন ডাইরি ও S. I.-এর নিজস্ব ডাইরি বইতে, ঐ তারিখ আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল বলে মিথ্যা লেখানো হবে, এটা হওয়া বা করা কি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু কষ্টকর ব্যাপার মনে করেন?"

আমি---' যদি এই বে-আইনী ওয়ারেণ্ট না মানি তা হলে কি করবেন?"

দারোগা—"সে ব্যবস্থা না করে কি এখানে এসেছি মনে করেন? এখনি টেলিগ্রাম করে নদীয়া হতে ওয়ারেণ্ট আনা হবে, এজন্য হয় তো বিকাল পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে দেরী হবে, কিন্তু লাভ কি?"

মনের মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম, দেরী করে কোন লাভ নেই বরং অশিক্ষিত জনতা কর্তৃক শান্তিভঙ্গের ভয়ই বেশী। আমার প্রাণের ভিতরটা আকুলি-বিকুলি করে উঠলো, বললাম, "আর দেরী নয় তুমি ওঠ, বল কোন পথ দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে চাও?" নূরুল হক্ আমায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানালো—"দুটি পথ! এক ভেড়ামারা হয়ে ট্রেনে যাওয়া, আর একটি এই পদ্মা পার হয়ে চড়ের উপর দিয়ে 'ব্যাঙ গাড়ীর' নিকট হয়ে, বড় রাস্তা ধরে বিলমারিয়া কুঠির সামনে দিয়ে ঝাঁপড়ে বটতলা দিয়ে, লালপুর থানায় নিয়ে যাওয়া, যে পথে ইচ্ছা আপনি যেতে পারেন।"

বললাম, "ভেড়ামারা যেতে হলে চব্বিশ মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হবে, গাড়ীই-বা কোথা পাবেন? কেউ গাড়ী দেবে না অথবা দেরী হলেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। আমাকে নিয়ে যাওয়া আপনার কষ্টকর হয়ে উঠবে। চলুন, আর দেরী না করে পদ্মা পার হয়ে পড়ি, লোকজন জমায়েত হবার আগেই।"

দারোগা—"আজ্ঞে তাই চলুন! আমাদের সঙ্গে দুটো ঘোড়া আছে—একটায় আপনি উঠুন, বরকন্দাজ লাগাম ধরে ধরে নিয়ে চলুক।"

নিয়ামতউল্লা এতক্ষণ ধরে নীরবে সব শুনছিল কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলো না। চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলো, আমিও তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললাম। ভোরের সামান্য জনতাও হাহাকার করে উঠলো, নিয়ামতভাই আমাকে গোপনে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো "নিয়ে যেতে দেবো না,

কার সাধ্য নিয়ে যায়।" আমি বললাম, "ভাই, দারোগা অসহায় হয়ে আসে নি, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই সৈন্য কিছু এসেছে, কি করবে ভাই তাদের বিরুদ্ধে?" নিয়ামত জানালে —'পদ্মার জলে সবই তো আমাদের নৌকা—বহু দাঙ্গা পদ্মায় হয়ে গেছে, সবাইকে নিয়ে পদ্মায় ভেসে পড়বো, তারপর যখন স্রোতপূর্ণ চড়ায় নৌকা পড়বে (পদ্মায় এখন জোয়ার চলছে) তখন হালের নীচের একটা তক্তা খুলে যাবে ও 'নৌকাডুবি' হবে! সব ক্ষমতা স্রোতের জলে ভেসে যাবে, আপনিও ভাসবেন, অন্য নৌকা আপনাকে তুলে নেবে, ওদেরও কাউকে কাউকে তুলে নেওয়া হবে। নৌকা চড়ায় ডুবেছে, 'আমরা তার কি জানি?' আমি নিয়ামতের কথা শুনে স্তম্ভিত ও তার কৌশল কুশলতা আমাকে বিস্মিত করলো, আমি তাকে পুনরায় আশীর্বাদ করে বুকে ধরে শান্ত থাকতে বললাম, ধন্যবাদও জানালাম, "কিন্তু কোন লাভ নাই ভাই, ঐ কৌশলে—ওদের লাঞ্ছনা করে আমায় বাঁচাতে চাও কিন্তু ওরাও তো আমার ভাই? ওরাও আমাকে ভালবাসে।"

নিয়ামত ধীরভাবে উত্তর দিল, "প্রাণে কাউকে মারতে চাই না, জলে ডুবে নাকানি চোবানি খাইয়ে দেখাতাম, এখান হতে ধরে নিয়ে যাওয়ার ফল।" নিয়ামতের হাত ধরে বার বার অনুরোধ করলাম "ধর্মঘট যেন বজায় থাকে, আর কিছু চাই না হাসিমুখে বিদায় দাও।"

বাইরে লক্ষ্য করে দেখি চারদিক হতে লোক ছুটছে, বাড়ীর মধ্য হতে গরম দুধ এলো, পান করে পদ্মার দিকে রওনা হলাম। সেই স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে ঢোল ও ঢাকের বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি কানে ভেসে আসতে লাগলো।

আমার একদিকে নিয়ামত ও অপরদিকে নূরুলহক্। আমরা পদব্রজেই পদ্মার দিকে চলেছি, আমাদের পাশে ও পিছনে জলভরা চোখে জনতাও চলেছে নীরবে। ধানক্ষেতের শুকনো নাড়াগুলো ও মানুষের পায়ের চাপে শুকনো পাতার ফর্‌ফর্ শব্দ দূরাগত ঢাক-ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে মিশে যেন বিদায়ের করুণ সুরেরই সৃষ্টি হয়েছে মনে হচ্ছিল। ক্রমেই যেন কোলাহল নিকটবর্তী হতে লাগলো। মধ্যে মধ্যে 'বন্দেমাতরম্, আল্লাহো আকবর' রবে দিগন্ত মুখরিত হতে লাগলো। যতই কোলাহল বেড়ে ওঠে ততই সেখান থেকে চলে যাবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো। দ্রুত পদচালনায় আমরা ঠেঁটেরপাড়ার ঘাটে এসে দেখি সেখানে সঙ্গীনসহ সৈন্যশ্রেণী সমাসীন, নিয়ামতভাইকে বললাম 'দেখ।'

আমি পদ্মার তীরে পৌঁছাতেই হাবিলদার মেজরের আদেশে সৈন্যগণ

সামরিক কায়দায় আমাকে সেলাম দিয়ে রাইফেলের মুখ নীচু করে ধরলো, হাবিলদার মেজর তিন পা এগিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন জানালো। আমি তাঁকে প্রত্যাভিবাদন জানালাম।

আমি নিয়ামতভাইকে অনুচ্চস্বরে জানালাম, "ভাই! সসৈন্যে হাবিলদার মেজর আমায় রাজোচিত সম্মান করেছে, এদের কোন দোষ নেই! এরাও তো আমাদের ভাই!" আমার কথায় নিয়ামত খুসী হতে পারলো না, এদের জব্দ করতে পারলেই বোধহয় বেশী খুসী হতে পারতো। আমরা নৌকোয় উঠলে, নৌকো ছাড়লো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! পদ্মার স্বচ্ছ নীল জলের ওপরে সৈন্যগণসহ আমরা ভাসছি, পদ্মার হাঁটু জলে ও কিনারে দাঁড়িয়ে ক্রমবর্ধমান স্তব্ধ জনতা, মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি ও 'বন্দেমাতরম্', 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি হচ্ছে, সে কি প্রাণমাতানো দৃশ্য! সবার চোখেই জল! আমি হাত উঠিয়ে সকলকে অভিবাদন করতে লাগলাম। আমাদের নৌকো ধীরে ধীরে তীর হতে দূরে সরে যেতে লাগলো, নৌকো নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও আমাদিগকে রাস্তা ছেড়ে দিতে লাগলেন। নৌকো যত দূরবর্তী হতে লাগলো, চীৎকার ও জয়ধ্বনি যেন ততই বাড়তে লাগলো। জনতার ঘনসন্নিবেশকে ক্রমে শুভ্র কাশবনের ন্যায় মনে হতে লাগলো, এইবার জলস্রোতের কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ মনকে আকর্ষণ করলো, নৌকো জোরে চললো। বেলা আটটার সময়ে নৌকো হতে চড়ের বালিতে নামলাম, পদব্রজেই চলতে লাগলাম, পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নি; কেবলমাত্র উৎসুক নরনারী আমার প্রতি লক্ষ্য করে ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াচ্ছিল, কেউ-বা একটু দুঃখ করছিল মাত্র। আমি যতদূর এসেছি সকলকেই ধর্মঘট বজায় রাখতে বলেছি। বেলা যত বাড়তে লাগলো, রোদের প্রচণ্ড তাপে বালুকাময় পথ অগ্নিময় হয়ে উঠলো। খালি পায়েও চড়ভূমিতে চলাফেরায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন আমার পায়ের তলায় ফোস্কা দেখা দিল, আমি আর চলতে পারছিলাম না। কিছুদূর ঘোড়ায় চড়ে এসে পুনরায় পদব্রজেই চলতে লাগলাম, মনে হল জেলের কয়েদী আমি—আমার পায়ে চলাই উচিত!

বেলা এগারটার সময়ে নূরুলহক্‌সাহেব অগ্রসর হয়ে বললেন "আমি বিলমারিয়ায় আপনার সঙ্গে মিলবো।" আমি সম্মতি দিলাম। বেলা যখন প্রায় একটা তখন আমরা এসে বিলমারিয়া কুঠির সামনে উপস্থিত হলাম, দেখলাম যে রাস্তার ধারে কদমতলায় Major Tailor কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মচারী নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। দারোগা যে কেন আগে এসেছিলেন এখন তা উপলব্ধি করলাম। পুলিশের লোক আত্মীয় হলেও তাদের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পদে পদেই পাওয়া যাবে। নূরুলহক্ দুদিকেরই মন রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এত করেও তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল! কেন না, আমার কোমরে দড়ি দেওয়া নেই। তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ইন্সপেক্টরকে সুখসম্ভাষণে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। সে সময়ে নূরুলহকের মুখের চেহারা দেখে আমার খুবই মায়া হলো—কেন না উভয়কুলই তার নষ্ট হয়ে গেল। তিনি আর কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। আমি তখন সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললাম "হাতকড়ি দেবার মালিক তো Tailor সাহেব নয়, যে তার খুশীমত কাজ হবে!"

Tailor—"কেমন হয়েসে—এখোন যাও, জেলে বসে বসে ঘানি টানো।"

আমি—"নমস্কার সাহেব! আমি চললাম, কিন্তু ঠেলা বুঝবে তুমিই আগে, তোমাকে আর বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না, ডেরাডাণ্ডা তুলে দেশে যেতে হবে, আমি যে তোমার কি রকম উপকারী বন্ধু এইবার বুঝতে পারবে। খোঁড়া ও এক হাত কাটা মানুষ বলেই তোমাকে জানতাম কিন্তু এখন দেখছি তুমি অন্ধ?"

Tailor—"যা—যা—তুই ঘানি টান্‌বে, আমি কানা কি অন্‌ধা আছে পোরে দেখা যাবে।"

তৃষ্ণা অনুভব করে কর্মচারীদের কাছে জল চাইলাম, "একটু জল"! মনের গোপন ইচ্ছা একবার প্রসন্নর জননীর সঙ্গে দেখা করা ও তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসা। যাই হোক, একজন একটু জল এনে দিল, জল খেয়ে সেখানে উপস্থিত যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আশীর্বাদ করে লালপুর রওনা হলাম। লালপুর পৌঁছুলাম বেলা প্রায় আড়াইটা কি তিনটা, নৌকোযোগে হাবিলদার মেজর সৈন্যগণকে নিয়ে বোধ হয় পাকশী হয়ে গেছেন। আমি মাননীয় দেশবন্ধুর কাছে এ অঞ্চলে কর্মী পাঠানোর জন্য টেলিগ্রাম করলাম এবং আমাকে যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাও জানালাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত জনস্রোত বইতে লাগলো লালপুর থানায়। আমি থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত থাকতে ও ধর্মঘট বজায় রাখতে ও ধাপাড়ী যেতে বললাম। আমি লালপুর থানাতেই সে রাত্রি থাকলাম, নূরুলহক্ ও তাঁর স্ত্রী আমাকে খুবই যত্ন করলেন। প্রাতে উঠেই আমাকে নিয়ে যাবার উদ্‌যোগ-আয়োজন হতে লাগলো। একটা জিনিস আমি

লক্ষ্য করলাম, আমার হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি দেবার জল্পনা কল্পনা চলছিল কিন্তু সেটা কাজে পরিণত করতে সাহস কেউ করছিল না। আমি ব্যাপার বুঝে নিজেই জমাদারের কাছে হাতকড়া চেয়ে নিয়ে চাবি আটলাম এক হাতে, অন্য হাতে জমাদারকে এঁটে দিতে বললাম। জমাদার আপত্তি জানিয়ে তার অনিচ্ছা জানালো। আমি বললাম "আমি স্বেচ্ছায় পরছি, তোমার কোন দোষ নেই।" যাইহোক হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি নিয়ে খুনি ও চোরের বেশে টম্‌টমে উঠলাম। আরও কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ রাজসাহী হতে এসেছে আমাকে রাজসাহী নিয়ে যাবার জন্য। দারোগা ও জমাদার, চৌকিদার এবং সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত হয়ে আমার টম্‌টম্ ছেড়ে দিল। টম্‌টম্ ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। পথপার্শ্বের লোকের ভীড়ের মধ্যে দেখি Tailor সাহেবও দেখতে এসেছেন, তাঁর টম্‌টমে চেপে, আমার হাতে হাতকড়া লাগানো হয়েছে কি না দেখতে। দারোগাসাহেব ও Tailor সাহেবের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ও হলো। জনতা অধীর ভাবে চীৎকার করতে লাগলো আমার সেই অবস্থা দেখে। আমি হাতকড়া সমেত হাতযোড় করে সকলকে ধর্মঘট বজায় রেখে শান্ত ভাবে থাকতে বললাম।

যথাসময়ে গোপালপুর স্টেশনে ও তথা হতে ট্রেণযোগে নাটোর পৌছুলাম। স্টেশনে ট্রেণে বহু লোক 'বন্দেমাতরম্' ও 'জয় জয়' রবে আমাকে বিদায় দিল। নাটোরের আগেই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। ট্রেন থামতেই আবার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে লোক জমায়েত হয়ে গেল। কোনরূপে ভীড় ঠেলে আমাকে D. S. P. মহোদয়ের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি আমার হাতে হাতকড়া দেখে রাগে অগ্নিতুল্য হয়ে উঠলেন। এ রকম হতে পারে সেটা আমিও মনে মনে ভেবে-ছিলাম, কোমরের দড়িটি আমি নিজেই খুলে ফেলেছিলাম আগে। যাইহোক দারোগা ও জমাদারকে ঐ হাতকড়ার জন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। আরও বেশী লাঞ্ছনা তাদের হতো, যদি না আমি জানাতাম যে ঐ হাতকড়া আমি নিজেই পরেছি। তখন তিনি কিছুটা শান্ত হলেন, প্রকৃত ঘটনা কি তাও তিনি অনুমান করেছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই অন্দরের দিকে চেয়ে বললেন "মা! সোমেশ্বরবাবু এসেছেন!" তাঁর আহ্বানের পরই আমার পাশে কাঠের পার্টিশানটির পাশ হতে একটি মাতৃমূর্তির দর্শন পেলাম। তাঁকে দেখেই বুঝলাম, ইনিই 'মা'—আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনিও আশীর্বাদ

করলেন এবং সজলনয়নে আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। ক্ষণ-পরেই পাশের ঘরে আমার আহারের জন্য ডাক পড়লো। এত দুঃখের মধ্যেও জননীর স্নেহ হতে আমি বঞ্চিত হই নি, বলতে কি আমি যে বন্দী তাও ভুলে গেলাম। জেলে গেলে আর কোন ভাল খাবার পাবো না তাই মাতৃদেবী আমাকে যে কত ভাল ভাল খাবার খাইয়েছিলেন, তা অধিক কি বলবো? খাওয়ার সময় আমার স্নেহময়ী দুখিনী জননীর কথা মনে করে চোখে জল ভরে উঠলো। D. S. P. ও তাঁর মা উভয়েই আমাকে সজলনয়নে সান্ত্বনা দিলেন। বিদায়কালে নাটোরের শ্রেষ্ঠ সন্দেশ 'রাঘবসাই সন্দেশের' একটি চুপড়ী আমায় দিয়ে বললেন, "বাবা এগুলি তুমি রাস্তায় খেয়ো।" সেখান হতে D. S. P. মহোদয়ের সঙ্গে চললাম, মোটরবাসে রাজার মত। দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে রাজসাহী চললাম। তখন নাটোর হতে রাজসাহী পর্যন্ত মোটরবাসই চলতি ছিল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে আমাকে নিয়ে পুলিশের রিজার্ভ বাস রাজসাহী পৌঁছুলো। 'বন্দেমাতরম্' রবে সহরের ভিতর কয়েক স্থানেই বাস জনতা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তন্মধ্যে রাজসাহী কলেজ হোটেলের ছাত্রগণ ও সহরবাসীগণ কর্তৃক বাস এমন বাধা প্রাপ্ত হল যে আমাদের দেরী হয়ে যেতে লাগলো। আমি করযোড়ে অনুরোধ জানালে ঐ বাস যাবার রাস্তা পায়।

আদালতে হাজির হলাম, বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বোধ হল। অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন সোমেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব। সোমেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। D. S. P মহোদয় হৃষ্ট মনে Mr Reed কে সংবাদ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে Mr Reed এর সামনে হাজির করা হলো। তিনি তখন একটা কেস করছিলেন। তখনি ঐ কেসটি বন্ধ রেখে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন "Chowdhury I am very sory to see you here in this condition."

আমি—"But I am very glad Mr Reed to meet you here. You have given me the opportunity to take rest. I am so tired now."

তিনি ব্যস্তভাবে খাস কামরায় আমাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বসতে আদেশ করলেন। জামিনে মুক্ত হওয়ার জন্যও অনুরোধ করলেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "জামিন দিয়ে মুক্ত হওয়া বিষয়ে

কংগ্রেসের কি স্পষ্ট অভিমত তা আমি জানি না, তবে এ বিষয়ে যদি কংগ্রেসের নিষেধ থাকে, তা হলে আমি সাময়িক মুক্তি চাই না। আপনি প্রকৃতই যদি জামিন পাবার উপযুক্ত বিবেচনা করে থাকেন, তাহলে আপনিই আমার সবচেয়ে বড় জামিনদার। আপনি নিজের জামিনে আমায় ছেড়ে দিতে পারেন। এখানে আমার মত বদলোকের জামিন কে হবে?"

ঠিক এই সময়েই চট্টগ্রাম চাঁদপুর ধর্ম্মঘট ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়ে পূজনীয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাইও হাজতে নীত হয়েছিলেন। তাঁকে জামিন দেওয়া নিয়ে তখন কংগ্রেস মহলে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, আমি কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম, জামিন দেওয়া উচিত নয়। মিঃ রিড্ আমায় বললেন "আপনি জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা বলুন? তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি তাঁকে জানালাম "বর্তমানে জামিন দেওয়ায় একক আমি সংশ্লিষ্ট নই, আমার সমস্ত দেশ এতে জড়িত। আমার জামিন দেওয়া এখন সমস্ত বাংলা দেশের লজ্জার কারণ বলেই গণ্য হবে, কাজেই আমাকে ক্ষমা করুণ।"

মিঃ রিড আমাকে নানাভাবেই বোঝালেন, আমি পুনরায় কলেজে ফিরে গেলে ভবিষ্যতে আমার পিতার গবর্ণমেণ্ট পোষ্টটি পাবো বলে গ্যারান্টি দিতে চাইলেন। আমি তাকে বহু ধন্যবাদ দিয়ে বললাম "আমাকে বন্ধু হিসাবে স্মরণ রাখলেই আমি যথেষ্ট মনে করবো, এর বেশী কিছু চাই না।"

Mr Reed—"Europeans never forget their friends."

এই বলে তিনি আমার করমর্দন করলেন এবং জানালেন "আপনার পিতার বন্ধু বর্তমান রাজসাহীর সিভিল সার্জন আপনাকে ডেকেছেন।" D, S, P মহোদয় বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। সিভিল সার্জন মহোদয়ের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে পিতৃবন্ধু হিসাবেই যথেষ্ট সম্মান দেখালাম। তিনি সম্বলপুর হাসপাতালে থাকাকালীন আমার পিতৃদেবের সহকর্মী ছিলেন। তাঁর কাছ হতে আমার পিতার দুই একটি কথা শুনেই বুঝলাম তিনি আমার পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পিতৃবন্ধু হিসাবে তিনিও আমার সঙ্গে সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করলেন। তিনি আমাকে বহু প্রকারে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন "দেশের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা হলে ঐ সব দেশহিতকর কাজ করা আগে প্রয়োজন, শুধু রাজনৈতিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকে অন্য সব কাজ কিছুই হচ্ছে না।

আগে দেশে কলকারখানা বসিয়ে কাপড় বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী না করে কংগ্রেস কোটি টাকা চাঁদা তুলে অযথা ব্যয় করছে, এটা কি ঠিক ?" উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম "ভারতবর্ষের সমস্ত মনীষী একত্র হয়ে একটা ভুলই যদি করে থাকেন তো আমি সামান্য একজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সে বিষয়ে কথা বলার কোনই প্রয়োজন দেখি না। সুচিন্তিত কর্মপন্থার বিরুদ্ধে চিন্তা করে একজন সামান্য সৈনিক যদি মাথা খারাপ করতে থাকে তা হলে কি করে যুদ্ধ চলতে পারে ? আমাকে দেশের নেতৃবৃন্দ যা করতে আদেশ দিয়েছেন আমি তাই করবো। আমাদের নিজের হাতে দেশপরিচালনার ক্ষমতা এলে, আমরা আইন করে দেশের সামাজিক গোলযোগের মীমাংসা করে নেবো, এ ছাড়া একদল কর্মী সেবাকার্যে ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত এখনও আছেন।"

আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, "যাইহোক সে কথার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কর্তব্য হচ্ছে তোমাকে বোঝানো। যা বলার আমি বললাম। তোমার ইচ্ছা হয় আমার কথা মত কাজ করবে নচেৎ করবে না। আমার ইচ্ছা তুমি মেডিকেল কলেজে ফিরে গিয়ে কোর্স কমপ্লিট করে তোমার পিতার পোষ্টেই নিজেকে বহাল করো। সে বিষয়ে আমিও তোমার জন্য বন্দোবস্ত করতে পারি। আমার কথা মত তুমি কলেজে ফিরে যাও। তোমাকে চিন্তা করার জন্য আধঘণ্টা আরও সময় দিলাম।" নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হলে তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কি মত হলো ?" আমি তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে অনুনয়ে জানালাম, "এখন জেল থেকে ফিরে গেলে আমার দেশের পক্ষেও লজ্জার কারণ হবে, যখন কর্মের ভোগ শেষ হবে তখন দেশে ফিরে যাবো, তার আগে নয়। তখন যদি দয়া করে কোনরূপ সাহায্য করেন, আমি মাথা পেতে নেবো, এখন ক্ষমা করুন।" তিনি খুব বিরক্ত হয়েই বললেন, "তবে আর আমি কি করতে পারি। জেলে তোমাকে যেতেই হবে, কি খাবে বল।" আমার তখন জ্বর আসছিল, একটু জল চাইলাম, কিছুক্ষণ পরে সন্দেশ মিষ্টি অনেক রকম খেতে দেওয়া হল। "এত খাবার কি জন্য ?" বলাতে ডাক্তার সাহেব বললেন, "জেলেতো ভাল খাবার কিছু পাবে না, যা পারো এখন খেয়ে নাও।" জলযোগ করলাম। ডি, এস, পি ভদ্রলোক এসে আমার কাছে বিদায় নিলেন, এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে আমায় তুলে দিয়ে ডাক্তার সাহেবও বিদায় নিলেন। ঘোড়ার গাড়ী পুলিশ গার্ডে সহরের দিকে চললো এবং কিছুক্ষণ পরে ডানদিকে মোড় ফিরে

কয়েকটি বটগাছের তলা দিয়ে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল গেটে এসে গাড়ী পৌছুলে পুলিশ আমাকে জেলের খাতায় জমা করে দিয়ে আমাকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

আমি জেলে আসার কিছুক্ষণ পরে আমার জন্য একখানা নারকেল পাতার চ্যাটাই, একটি মাটির কলসী ও সরা, একটি লোহার থালা ও বাটী এনে দেওয়া হলো। একটি কম্বল ও একটি চাদর দিয়ে ডিক্রী বন্ধ করা হলো, যখন জেলে ঢুকি তখন আন্দাজ চার সাড়ে চার। বাইরে জলযোগ সেরেই এসেছিলাম, কাজেই খাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এক কলসী জল নিয়ে 'সেলে' প্রবেশ করলাম। সাড়ে পাঁচটায় সেলের লোহার গেট বন্ধ করে প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে বৃহৎ তালা লাগানো হল। জেল ওয়ার্ডার সেল বন্ধ করে বাইরে গিয়ে কাঠের বড় গেটটী বন্ধ করলো। আমার তখনও বিচার হয়ে শাস্তি হয় নি, আমি তখন 'বিচারাধীন কয়েদী।' আমাকে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে একটি বড় ওয়ার্ডে রাখা উচিত, কিন্তু তা রাখা হলো না।

আমি যেদিন হাজতে পড়লাম ঠিক তার সাতদিন আগেই এই জেল ভেঙ্গে সমস্ত কয়েদী পালিয়েছিল। জেলে তখন যে খুবই কঠোর শাসন চলছে তা বলা বাহুল্য। রাত্রে আমার জ্বর অসম্ভব রকম বেড়ে উঠলো। আমি তিনদিন তিনরাত্রি অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলাম। চতুর্থদিন জ্বর একটু কম পড়লে দেখি যে সিভিল সার্জনসাহেব আমার সেলে এসে বেঞ্চির ওপর বসে আছেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন। এখানে এসেও তিনি সেই বণ্ড সই করে মুক্তি নিয়ে কলেজে ফিরে যাবার কথা বলছেন। একটি কাগজে সই করবার জন্য বললেন এবং সেটা আমায় দেখালেন। আমি কিছুতেই রাজী হই না দেখে তিনি উঠে যাবার সময় বলে গেলেন "জেল কি জিনিস তা জানো না, এইবার সেটা জেনে রাখো।" আমি তাঁকে নমস্কার জানালাম, তিনি সদলবলে চলে গেলেন, সেল বন্ধ হয়ে গেল।

সাহেব চলে যাবার পর হঠাৎ একটি চাপা গলায় শব্দ হল "সোমেশ্বর ভায়া! নমস্কার! আপনার জ্বর ছেড়েছে?" প্রথমে আমি কিছু বুঝতে পারি নি ব্যাপারটা। দুই তিনবার নমস্কার জানাবার পর আমি কিছু বুঝতে পারলাম যে, বক্তা যিনিই হন না কেন, তিনি আমারই খোঁজ নিচ্ছেন, আমি উত্তর দিলাম, "নমস্কার! জ্বর এখনও ছাড়ে নি—আপনি?"

উত্তর—"আমি নগেন্দ্র ব্যানার্জী, গৌহাটী স্যুটিং কেসের আসামী। আপনার সেলের একটা সেলের পরেই আছি। আমি গম পেষার কাজ করছি। আর না, অন্যদিন হবে। হরদয়াল সিং আপনাকে নমস্কার করছেন।" ক্ষণকাল পরে আরো একটু দূর হতে আওয়াজ এলো "নমস্কার! বাইরের খবর কি রকম? আর কতদিন এভাবে কাটাতে হবে? গান্ধীজির আন্দোলন কি বাংলাদেশ বুঝতে পেরেছে?" আমি প্রতিনমস্কার দিয়ে জানালাম "দেশের যা অবস্থা তাতে স্বরাজ আনতে এখনও অনেক দেরী, আন্দোলন বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করেই বাংলাদেশ তাহার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আশাকরি ফল শুভই হবে।"

উত্তর—"আচ্ছা নমস্কার, কথাবার্তা পরে হবে।"

আরম্ভ হল কারা জীবনের কঠোরতা। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে, আমার বিচারে শাস্তি না হতেই আমাকে সেলে রেখে কঠোরতা অবলম্বন করা হলো কেন। যাইহোক, যথা নিয়মে দিন কাটতে লাগলো। অসুস্থ শরীরে রাত্রিতে আমার ওপর এক অত্যাচার আরম্ভ হল। এ কয়দিন জ্বরে বেহুঁস ছিলাম, কি হয়েছে না হয়েছে বুঝতে পারি নি; আজ হতে ঠিকমত সব উপলব্ধি করতে লাগলাম। ভোরের আলোয় দেখলাম, আমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমার ভিতরের দরজা খুলে দিল একজন সিপাহী। বাইরের কাঠের দরজা যেমন বন্ধ ছিল বন্ধ করা হল। আমার ঘরটুকুর মাপ হবে বোধ হয় ৫ × ৭ হাত। গৃহতল হতে অন্ততঃ দশ ফুট ওপরে ক্ষুদ্র একটি গবাক্ষ আছে, জানালা বলতে কিছু নেই, গবাক্ষটি সুদৃঢ়, লোহার গরাদ দ্বারা সেটা সুরক্ষিত। ঘরের ভেতর একটি ইটের তৈরী বেদী আছে, একজন মাত্র তাতে শয়ন করতে পারে। ঐ বেদীর ওপরে ইটের তৈরি একটা বালিশমত আছে, এটাই উপাধানের কাজ করে। ঘরের এক কোণে একটি যাঁতা বসান আছে। অপর একটি কোণে আলকাতরা জমানো দুটি টুকরি, একটি মল ও অপরটি মূত্র ত্যাগের জন্য। কাছে একটা টুকরিতে মাটিও থাকে। প্রথম কয়দিন দাস্ত হয় নি, দরজায় বসেই মূত্র ত্যাগ করতাম ও কলসী হতে, জল ঢেলে দিতাম। আজই প্রথম সেল পরিষ্কার করতে এসে মেথর (কয়েদী) বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো "আর কতদিন স্বরাজ হতে দেরী, আর কতদিনই-বা জেলে থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমার কাছ হতে তার কথার উত্তর পেয়ে সে বোধ হয় একটু খুসী। তাই হৃদ্যতা জানিয়ে বললো সেলের বাইরে যে সাত আট হাত প্রাঙ্গণ, তাতে একটি চৌবাচ্চা আছে, ঐ

চৌবাচ্চা আজ কয়েকদিন হতেই ভর্তি রয়েছে। ঐ জলে আমাকে স্নান হাত-মুখ ধোয়া ও বাসন ধোয়ার উপদেশ দিয়ে চলে গেল।

তার কথামতই বাইরের জলে হাতমুখ ধুয়ে সেই লোহার থালা বাটী মাজতে বসলাম, ঐ বাসন মাজা এক অদ্ভুত ব্যাপার। যতই মাজি না কেন কালি উঠানো যায় না। বহুক্ষণ মেজে একটু পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখলাম। মাথা ও হাত পা ধুয়ে ঘরে গিয়ে বিছানার ব্যবস্থায় লাগলাম। প্রথমে চ্যাটাই ও তার উপর কম্বল এবং তার উপর চাদরটি বিছিয়ে বসতে গিয়ে দেখি সে এক কণ্টক শয্যা! এ কয়দিন জ্বরের ঘোরে খালি মেঝেতে চাদর পেতে শুয়েছিলাম। ব্যাপার দেখে আজও পুনরায় ঐ মাটিতেই চাদর বিছালাম। একটু পরে প্রাতঃরাশ এলো। এক হাতা খুদ ঘাঁটা। প্রথমে দেখে তার কিছু বুঝতে পারি নি, মুখে দিয়ে দেখি সে এক অখাদ্য! এই জ্বরভোগের পর প্রথম পথ্য হিসাবে সেই কদর্য খাদ্য মুখে দিতে পারলাম না। শুনলাম এই পরমান্ন কোনদিন গুড় কোনদিন-বা হলুদ নুন সংযোগে নিত্য নূতন করা হয়। কিছুক্ষণ পরেই সিভিল সার্জেন জেল দেখে গেলেন, তারপর জেলের নিয়মিত কাজ আরম্ভ হয়।

বেলা দশটা বাজতেই কয়েদীদেব ভাত দেওয়া হয়, এটাও আমার জানা ছিল না। হঠাৎ আমার সেই আঙ্গিনার সেই কাঠের দরজা খুলে গেল, একজন সিপাহীর সঙ্গে একজন কয়েদী ভাত আনলো। আমি অসুস্থ ছিলাম—সাবু এনে দিল, জলসাবু, দুধ চিনি গুড় কিছু নেই, শুধু ঘন-সাবু সিদ্ধ, সাবুর চাপ মগে করে এনে আমার সেই থালায় ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। মাজা থালায় লোহার মরিচা ধরা হলদে রং-এর কষ উঠেছিল, সেটা সাবুতে মিশে একটা অপূর্ব খাদ্যে পরিণত হল। খাওয়া হল না, পেটে ক্ষুধা রয়ে গেল, জল খেয়ে সেদিনটা কেটে গেল! এপ্রিল মাসের গরমে সমস্ত দিনই ঐ ঘরটুকুর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, একবার বসি, একবার দাঁড়াই এবং মাঝে মাঝে সেই চাদরে শুয়ে পড়ি। পাশের সেল হতে আজও পুনরায় নমস্কার এলো, আমিও দিলাম, নরেনবাবু নেপথ্য হতে পুনরায় বললেন, "জেল কেমন লাগছে?" বললাম "ভালই, তবে ঐ কণ্টক শয্যায় (অর্থাৎ কম্বল শয্যা) শোয়া দুরূহ ব্যাপার, থালাটির হলদে মত কষ কি করে পরিষ্কার করা যায়?"

নরেন্দ্রবাবু—"ঐ কম্বলটি মেঝেতে ইঁটের ওপর জোরে ঘষলে কাঁটার মত বড়

বড় লোমগুলি খুলে পড়বে, আর থালা বাটি পুরাণো হলেই ভাল হয়, নূতন ভালো নয় কিন্তু এখন কি উপায়, সঙ্গে সঙ্গে মেজে নিয়ে ভাত খাবেন।”

কোনরূপে দিন কাটলো। পাঁচটায় আগের মত ভাত ও আমার জন্য সাবু এলো। এবারও মুখে দিতে পারলাম না, জল খেয়েই রাত্রি কাটলো। বিকেল সাড়ে পাঁচ ছয়টার মধ্যে সমস্ত কয়েদী 'গুন্তি' করে ব্যাচ্ ব্যাচ করে কয়েদীগণকে ঘরে তোলা হয় ও লোহার গেট বন্ধ করা হয়। রাত্রে আরম্ভ হয় সে এক ব্যাপার। ওয়ার্ডার বদলী হলেই সব ওয়ার্ডের মধ্যে গুন্তি হয়ে থাকে। মেট কয়েদী যখন বলে সব ঠিক আছে, তখন চার্জ বদল হয়। রাতে দুই তিনবার পাহারাদার বদল হয়, এই দুই তিনবারই আগন্তুক পাহারাদার সমস্ত কয়েদী ঠিক আছে কিনা দেখে নেয় এবং 'সব ঠিক হ্যায়' বললে পাহারা বদল হয় ও পূর্ববর্তী পাহারা-দারের ছুটি হয়। এই নিয়মানুযায়ী পাহারা বদলালেই ঝর্ ঝর্ করে লোহার গেটের চাবি টেনে দেখা হয়। হাই হাই শব্দে কয়েদীর সাড়া নিয়ে জানা হয় কয়েদী জীবিত না মৃত। (যদি কেহ আত্মহত্যা করে তাই) এই সতর্কতা! আমার সেলেও এই ব্যাপার আরম্ভ হল, দু-একজন পাহারাওয়ালা একটু দয়া করে বা 'স্বদেশীবাবু' বলে স্নেহ করে মিষ্ট সুরেই 'বাবুজী ঠিক হ্যায়' ইত্যাদি সম্মান-জনকভাবে সংবাদ নিত। ইহা ভিন্ন অধিকাংশই গরুর মত অসভ্য ভাবে বীভৎস চীৎকারে ডাকতো। একে তো ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম আসে না—আসা কঠিন। তার ওপর যদিবা ঘুম আসে তো অমনি ঐ ঝর্ ঝর্ আওয়াজ, হাই হাই বিকট চিৎকার শব্দে বিনিদ্র রাত্রি কাটালাম। পরদিন অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম এরূপ অত্যাচারের একটা যা হোক প্রতিকার করা চাই। যথানিয়মে রাত্রি এলো, যে ওয়ার্ডার প্রথমে ছিল তাকে ডাক দিয়ে বুঝিয়ে বললাম, আমার সেলে যেন ঐরূপ শব্দ বা চীৎকার না করা হয়, করলে গোলযোগ উপস্থিত হবে। কিন্তু কে শোনে আমার কথা! ঠিক সময়ে যথানিয়মে সেই 'ঝর্ ঝর্ হাই হাই' আরম্ভ হলো, আমি প্রতিকারের ভার নিজ হাতে নিলাম। যেমন চাবিতে হাত দেওয়া অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে গালি আরম্ভ করলাম। আমার গালাগালি ও চীৎকারের চোটে জেলখানায় প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। চারদিক হতে লোক ছোটাছুটি করতে লাগলো। আমার সেলের সামনে এসে বড় জমাদার ও আরও সেপাই এসে হাজির হয়ে জানতে চাইল "কাহে এ্যায়সা হল্লা উঠাতে?" আমি জানালাম "চার পাঁচদিন আমি অসুস্থ, তার ওপর ঐ অখাদ্য খেতে পারি নি।

আমি ক্ষুধার্ত, তার ওপর এই অসভ্য রকমের চীৎকার! আমি বাধ্য হয়েই এই পথ নিয়েছি, হয় আমার সেলে ইহা বন্ধ করা হোক, নতুবা আমাকে খুন করে এই যন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি দেওয়া হোক! এর আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই।"

বড় জমাদার আমাকে জানালো, "আপনাকে বেত মারা হতে পারে।" আমি তাকে জানালাম, "খুনের চাইতে বেত মারা বেশী কিছু নয়। যাও তোমরা সাহেবকে বলো, তিনি যেন কাল আমায় খুন করেন! আমি বেঁচে থাকতে এ উপদ্রব কিছুতেই সহ্য করবো না। সে রাত্রে আর কোন উপদ্রব হল না, কিন্তু পরদিন সকালেই 'সিভিল সার্জন' আমার সেলে এসে উপস্থিত, কাল রাত্রে ওয়ার্ডারদের কাজে আমি ব্যাঘাত ঘটিয়েছি কেন, জানতে চাইলেন।

আমি—"আপনার ওয়ার্ডারদের কাজে যদি আমার জীবন যাবার সম্ভাবনা হয় তা হলে আমি কি করতে পারি?"

সাহেব—"এটা তো কারো শ্বশুর বাড়ী নয়, এটা জেলখানা। ঐ চিৎকার এখানকার একপ্রকার শাস্তি! জেলের যা আইন, তা অবশ্য মান্য, এটা অমান্য করলে বেত্রাঘাত হয়।"

আমি—"বেত্রাঘাত দূরের কথা, আমাকে কেটে ফেললেও আমি চিৎকার সহ্য করবো না।"

সাহেব—"কি উপায়ে এটা বন্ধ করা হবে ঠিক করেছেন?"

আমি—"গালাগালি চিৎকার যা আরম্ভ করেছি তা প্রথম দফা, তাতেও কিছু না হলে কলসীসরা ভেঙ্গে মারবো। তাতে না হয় ঐ থালাবাটি ভেঙ্গে মারবো, তাতেও যদি কিছু না হয় তবে মলমূত্র ও থুথু ছিটিয়ে তাকে ভাসিয়ে দেবো, যে গোলযোগ করবে তাকে। আমার প্রতি যে শাস্তি দিন না কেন মাথা পেতে নিতে রাজী আছি কিন্তু রাতে ঐ অত্যাচার সহ্য করবো না। বেত্রাঘাত? রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র বসে থাকার চাইতে বেত্রাঘাত সুখকর।"

সাহেব—"আপনি যদি আত্মহত্যা করেন তবে তার জন্য দায়ী হবে কে?" সাহেবের কথায় আমার হাসি এল. আমি হাসতে হাসতে বললাম, "ওঃ! আমার প্রাণের ওপর মমতা আপনাদের কম নয়, কিন্তু এতো চেষ্টা করে মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হচ্ছে! আত্মহত্যা নিবারণ করা হচ্ছে না, আমার পক্ষে ইহা ঠিক যে যদি এই অপমানকর ব্যাপার বন্ধ করতে না পারি তবে নিশ্চয়ই

আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শেষ একটা কিছু না দেখে মরতে রাজী নই। স্বরাজের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করছি, তারও বা কি করা যায়, কতদূর কি হয় দেখে তবে মরার ইচ্ছা।" সাহেব আমার কথায় হেসে উঠলেন ও বললেন "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনও বহু পুরুষের মৃত্যু দেখবে তা সুনিশ্চিত।"

আমি—"আমার তাতে আপত্তি নেই, তবে এখন যেমন প্লীহা কাটানো চলছে, তাতেই আপত্তি বা প্রতিবাদ। বৃটিশ যদি ভারতমাতার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে চায়, তা হলে বহু পুরুষ কেন, চিরস্থায়ী হলেও আমরা অসুখী হব না; বরং সুখীই হবো।" সাহেব খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন এবং বললেন "যদি যেমন আছে সেই রকম থাকতে চায়?"

আমি—"তার উচ্ছেদকল্পে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

সাহেব—"আচ্ছা! বর্তমানে আমার জেলে কোন গোলমাল না করে থাকার চেষ্টা করলে আমি বাধিত হব।"

আমি—"রাতের ঐ ব্যাপার বন্ধ করুণ, আমি গোলমাল করবো না।"

সাহেব আপন মনে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। তবে রাত্রে দেখলাম যে আমার সেলের কাছে কোনরূপ শব্দ করা দূরে থাক জুতোর মচ্ মচ্ খট্ খট্ শব্দও বন্ধ, খুব সন্তর্পনে ওয়ার্ডাররা চলা ফেরা করছে। আমার সেলের বাহির প্রাঙ্গণের দরজা খুলে ভিতর দরজার পাশে বসে একজন ঘুম ভাঙ্গাতে বকবক করে বিরক্ত করতো কিন্তু তাকে আমার ভাল লাগতো কেন যে তা জানিনা; সেও একদিন আমায় বললো "আমি যে আপনাকে বিরক্ত করি সে জন্য তো গাল দেন না, অন্য সিপাহীরা আপনার এত বিষ নজরে পড়লো কেন?"

আমি—"তুমি আমাকে খাজা গজা খাওয়াও, অন্যে তো খাওয়ায় না।"

ওয়ার্ডার—"সত্যিই কি খাজা গজা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে?"

আমি—"না না! আমি কয়েদী—খাজা গজা খাওয়ার ইচ্ছা নেই, সত্যই যেন তুমি কোনদিন গোপনে কিছু এনো না, তা হলে খুবই বিরক্ত হবো; আচ্ছা ওয়ার্ডারদের ব্যারাকে কি আমাকে সবাই গাল দেয় নাকি?"

ওয়ার্ডার—"প্রথমদিন গাল দিয়েছিল, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় ও মীমাংসা করায় সকলেই এখন দেখি ভক্তি করে, কেউ আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।"

আমি—"কেন, তুমি ?"

ওয়ার্ডার—"যদি সত্যিই আপনি আমার ওপর রাগ করেন তবে আমিও আর বিরক্ত করবো না।"

আমি—"তুমি আমায় বিরক্ত করবে। না করলে দুঃখিত হবো, তোমার মত যদি সবাই করতো তা হলে এ অপ্রিয় কাণ্ড করতে হতো না। সবই মুখের কথা, কেউ কিছু দেয় না।"

ওয়ার্ডারটী আমায় বললে "বাবু! অন্যদের মত আমিও ছিলাম, একজন স্বদেশী কয়েদী এসে আমায় বদলে দিয়ে গেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, তিনি তার প্রতিবাদে আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। আমিও সেই ঘটনা বিকৃত করে সাহেবের কানে তুলি, ফলে পাঁচ ঘা বেত মারার হুকুম হয়। বেত খেয়ে যখন তিনি সেলের মধ্যে নির্জীবের মত কাতর হয়ে পড়ে আছেন, আমি তখনও তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করি। প্রতিবাদে তিনি এমন কাণ্ড করলেন যাতে 'পাগলা ঘন্টি' পড়লো। তাঁর ওপর অযথা মারধোর চললো, আমি তখন আমার ভুলের ও ঔদ্ধত্যের দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলাম, তিনি হাসিমুখে 'ভাই' বলে আদর করলেন। আমি তাঁর বহু সেবা শুশ্রূষাও করলাম, হাসপাতালে বাঙালী ডাক্তারবাবুকেও সব কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম। নিজের টাকায় ঔষধ সুঁই দেবার জন্য কিনে এনে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টা ও ডাক্তারবাবুর সকল ঔষধকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি বিষাক্ত জ্বরেই মারা গেলেন। আমি বেঁচে আছি বটে তবে সেই মহাপুরুষই আমাকে নূতন করে রেখে গেছেন।" বলতে বলতে তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো, এতক্ষণে বুঝলাম সামান্য জেল ওয়ার্ডারের ভিতর মধুরতার উৎসর কোথায় উৎপত্তি! চোখ মুছতে মুছতে ওয়ার্ডার চলে গেল।

আমার দিন জেলখানাতে কাটতে লাগলো, এমন সময় হঠাৎ রাজসাহীর পথে পথে 'বন্দেমাতরম্', 'দাশ মহাশয় কি জয়!' রবে দেশবন্ধুর আগমনবার্তা ঘোষিত হলো। হঠাৎ পরদিন বেলা নয়টার সময় আমাকে সেল হতে বাইরে আনা হলো এবং জেলগেটের অফিস ঘরে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমাকে বলা হলো— 'জামিনে মুক্তি', আমি তো কই জামিনের দরখাস্ত করি নি? আমি বিস্মিত হলাম, কি করে এরকম হলো? যা হোক জেল হতে বাইরে এলাম ও এসেই

শুনলাম গতকাল দেশবন্ধু সি. আর. দাশ মশাই রাজসাহী এসেছেন। তিনি সুদর্শন চক্রবর্তী মশাইয়ের বাসায় আছেন। আমি কাল বিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁর পদধূলি মাথায় নিলাম—তিনি আমায় আলিঙ্গন দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁকে জানালাম যে "আমার আরব্ধ কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, সামান্য বাকী আছে। আমার বিচারের দিন পর্যন্ত যে কয়দিন সময় পাই, এক মুহূর্তও বাজে কাজে নষ্ট করবার ইচ্ছা নেই। আমায় বিদায় দিয়ে অনুমতি করুন, আমি আমার কর্মস্থলে চলে যাই।" আমার মুখের পানে চেয়ে তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন, হাসতে হাসতে বললেন "আমার কাঠবিড়ালীই তা হলে সীতা উদ্ধারের সেতু বাঁধতে পেরেছে।" তাঁর চরণে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে সুদর্শন চক্রবর্তী মশাইয়ের বাসাতে আহার করে তাঁর বাড়ীর পেছনে দামেশের ঘাটে মুখ ধুয়ে আমার গ্রামবাসী সারদাপ্রসাদ হাজরা মশাইয়ের বাসায় দেখা করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে আমার ছোট মামা ও শ্বশুর মশাই কয়েকদিন আগে এসে আমাকে জামিনে খালাস করার চেষ্টা করেছিলেন। আমার অনিচ্ছায় তাঁরা কিছু না করতে পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন।

আমি পুনরায় শ্রীযুক্ত দেশবন্ধুর চরণে প্রণাম জানিয়ে নাটোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, যথাসময়ে নাটোর ও তথা হতে গোপালপুর ট্রেণযোগে গেলাম। স্টেশন হতে হাঁটা পথে ধাপাড়ী রওনা হলাম। পথের দুধারে লোকেরা আমাকে দেখে খুবই খুসী হল এবং নানা জনে নানা কথা আলোচনা করছে শুনতে শুনতে পথ চলতে লাগলাম---যথা গান্ধীর চেলাকে কি কেউ জেলে আটক রাখতে পারে? সে অদৃশ্য হয়েও থাকতে পারে ইত্যাদি—।

ঘনশ্যামদার আড়তে পৌছুলাম, আমাকে দেখে মহা খুসী হলেন তিনি। একটু বিস্মিতও হয়েছিলেন, আমার এই হঠাৎ মুক্তিতে। আমি জানালাম যে মিঃ রিড্ সাহেব আমাকে নিজ জামিনে সাময়িক মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞ ও সাদাসিধা চাষী সম্প্রদায় সে কথা মানতে রাজী নয়। তারা এই মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার আভাষ দেখতে ও তাহা গোপনের ঐকান্তিক চেষ্টায়, আমার মহত্ব খুঁজে পেতে লাগলো। এই সময়ে প্রজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় সাক্ষী দিতে 'পাঞ্জা' রাজসাহী কোর্টে যায়। হঠাৎ এই সংবাদ আমার কাছে পৌছুলো। আমিও গোপনে রাজসাহী আদালতে হাজির হলাম। পাঞ্জা পরামাণিককে খুঁজে একটা বটবৃক্ষ তলে তার দলবল সহ রয়েছে

দেখে তার পায়ে ধরে এই মিথ্যা মামলার সাক্ষী দিতে বারণ করি। পাঞ্জার সেই একই কথা, "নিমকহারামী করতে পারবো না।" পাঞ্জাকে বহু প্রকারে বুঝিয়েও আমি নিরস্ত করতে পারলাম না ; ক্ষুণ্নমনে (এক রকম কাঁদতে কাঁদতে) ফিরে এলাম।

উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মশাইয়ের অনুরোধে তাঁর বাসাতেই আহার করলাম। ঐখানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মশাইকে প্রথম দেখি। আমি শত চেষ্টাতেও পাঞ্জাকে মিথ্যা সাক্ষী হতে ফেরাতে পারি নি—পাঞ্জা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বাড়ী ফিরলো। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার মানুষের বোঝার ক্ষমতা নেই। এর কয়দিন পরেই সেটা সমস্ত মানুষের চোখে ধরা পড়লো—'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের' কথা আছে, পাঞ্জার মৃত্যু হল বজ্রাঘাতে। 'খোদার বিচারেই এটা হয়েছে'—এটা সব সরলপ্রাণ কৃষককুলকেও ভীত করে তুললো।

আমি যে পাঞ্জার পায়ে ধরে তাকে নিবৃত্ত করতে পারি নি, সে জন্যও লোকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। তার ওপর এই আকস্মিক দৈব দুর্বিপাকে চারিদিকে একটা ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। সোমেশ্বরের হুকুমকে খোদা বা ঈশ্বরের আদেশ বলে মানতে আরম্ভ করলো। এই ঘটনাটা দ্রুত চারিদিক প্রচারিত হয়ে পড়লো। দুষ্ট বদমায়েস—মিরজাফরের দল যে যেখানে ছিল সবাই ভীত হয়ে পড়লো। এমন কি অনেকে তাদের গোপন অপরাধের কাহিনী অনুতপ্তচিত্তে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছে। এজন্য রাগ করে তাদের যাতে কোন অভিসম্পাত না করি তারও বহু অনুরোধ তারা আমায় করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাকে আর কিছুই করতে হলো না। এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত রূপ কঠোর শাস্তিই যাদুমন্ত্রের মত কার্যকরী হলো। করুণাময়ের অপার করুণার ও সূক্ষ্ম বিচারের কথা মনে চিন্তা করে শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগলো। তাঁর কাজ তিনিই সুচারুরূপে সম্পন্ন করছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র, পদে পদে আমি তা উপলব্ধি করে বিস্ময় বিমুগ্ধ হতে লাগলাম।

আমি জেলে যাওয়ার পরই ধর্মঘট ক্রমান্বয়ে কঠোর হতে কঠোরতর হতে আরম্ভ করে। আমার সহকর্মী জাফরুদ্দিন মোল্লার আপ্রাণ চেষ্টায় ধর্মঘট পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকে এবং আমি জেল হতে জামিনে ফিরলে ধর্মঘট সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। আমাকে গ্রেপ্তারের পর হতেই কুঠির খানসামা, ঘেসেরী, মেথর বন্ধ হতে আরম্ভ হলো এবং কয়েকদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হলো যে

বরকন্দাজগুলিও, কাজ ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে। কুঠির নায়েব গোমস্তা সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বাড়ী হতে বের হওয়া যেন তাঁদের আশঙ্কার কারণ বলেই মনে হতে লাগলো। তাদেরই কৃত অত্যাচারই তাঁদের চারদিকে এক অচলায়তন সৃষ্টি করে তুললো। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ইন্দ্রপুরীতুল্য বিলমারিয়া কুঠি যে শ্মশানে পরিণত হতে পারে এটা Major Tailor স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন নি। কয়েকদিন অনাহারে রেখে শেষ পর্যন্ত তাঁর (ওয়েলার) ঘোড়াগুলিকে কলকতা পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন।

Major Tailor তার মেমসাহেবকে মুসলমান বিবিদের মত বোরখা ঢাকা দিয়ে গোষানে গোপালপুর পাঠিয়েছেন। গাড়ীর গাড়োয়ান হয়েছিল কোন এক ম্যানেজার সাহেবের ঔরস পরিচারিকার গর্ভজাত সন্তান। সেই লোকটি কুঠিতে খানসামার কাজ করতো। তাকে স্থানীয় লোকেরা একঘরে (অর্থাৎ নাপিত ধোপা সব বন্ধ) করেছিল। আমি এসে তাকে ঐ অবস্থা হতে মুক্ত করি। সাহেব নিজেও গোপনে পালিয়েছেন।

আমার মামলার দিন নিকটবর্তী হলে আমি রাজসাহী গেলাম, কিন্তু সে তারিখ মামলা হলো না, পুনরায় দিন পড়লো। আমি ফিরে এসে ভেড়ামারা হলুদবাড়ী ও চড়ের ভিতর দিয়ে ডাং মোরকা, শিকারপুর ইত্যাদি চারদিক ঘুরে দেখলাম যে, শ্রীভগবান্ সকল জায়গার কাজই সুসম্পন্ন করে রেখেছেন। যদি বা কেউ গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল তারা পাঞ্জা পরামানিকের পরিণাম দেখে, বিস্ময় ও ভয়বিহ্বল চিত্তে ধর্মঘটে যোগদান করতে লাগলো।

আমাকে কিছুই করতে হলো না। বহুজায়গা ঘুরে কুঠির আসল কারখানার দৃশ্যও লক্ষ্য করলাম, সেও এক শ্মশানের দৃশ্য। জমিতে নীল কতক কাটা আরম্ভ হয়েছিল, কতক বোঝা বাঁধা অবস্থায়, কতক গোগাড়ী বোঝাই হয়ে কারখানার রাস্তার পাশে পড়ে, কতক বা হোসের মধ্যে বোঝা আঁটাই হয়ে পড়ে আছে। যে কুঠির কারখানা একটি গঞ্জের মত মনে হতো, বর্তমানে শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। জনমানবহীন দৈত্যপুরীর মত সেগুলি পথিকের প্রাণে ভীতি বিস্ময় জাগিয়ে তোলে, ঠিক যেন কার "মরণ" কাঠির পরশে সমস্তই প্রাণহীন নিস্পন্দ হয়েছে। এ দিকের প্রত্যেক কুঠির ম্যানেজার ও সাহেবরা তখনও নীলকে বাঁচাবার ও কাজ চালাবার প্রাণপণ বিফল চেষ্টা করেছেন। আমাকে ঘুস দেবারও বহুরকম চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হলো না। যেটুকু বা

ক্ষীণ আশা ছিল তাদের, কিন্তু পাঙ্গাপরামানিক বিনামেঘে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালো, সেই দিনই সাহেবদেরও ঐ ক্ষীণ আশাটুকু চলে গেল তার ওপর ভগবানের দেওয়া শাস্তি! একাদিক্রমে পনের দিন ধরে প্রবল বর্ষণধারা! হাউলো ও পদ্মার জল ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং নীলের জমিগুলিও জলে ডুবে নষ্ট হয়ে গেল। M. N. Cowford কুঠি ছেড়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচালেন। শ্রীভগবান্ যেন মানুষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই নীলের অস্তিত্ব লোপ করতে তৎপর হয়েছেন, ভগবানের কাজ তিনিই পরিপূর্ণ করলেন! এই ব্যাপারে সাহেবদের ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকার ওপর হয়েছিল। যেখানে গেছি সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছি। চারদিকের উৎসাহ ও দৃঢ়তা দেখে আমি নিজেও যেন বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম এ আমি কোথায় এসেছি? এদের কিছুদিন আগেও তো অন্য রূপ ছিল; যারা শাসনপিস্ট হয়ে প্রাণ দেবতাকে ভুলেছিল, আত্মসম্মান ও মর্যাদাহীন ঘৃণ্য পশু জীবন যাপন করাই যাদের করণীয় ও বরণীয় বলে জ্ঞান ছিল এরাই কি তারা? এরাই কি সেই অতীতের অত্যাচারিত সর্বহারা কৃষককুল! শঙ্কাজড়িত ছিল যাদের প্রতি পদবিক্ষেপে, কুণ্ঠা ছিল যাদের কথায় ও কাজে, আজ যেন দেখছি নব জীবনের বিজয়োৎসব! নবীন আলোক ধারা স্নাত যাত্রী আজ যেন মুক্তকণ্ঠে গাইছে, 'এই তো এসেছি আর চিন্তা নাহি।' মৃত্যুহীনপ্রাণ সব হাসতে হাসতে একতার ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলেছে, হিংসা, দ্বেষ, জাতি ধর্ম উচ্চ নীচ সব একত্রে মিশে—'মানবতা' রূপে দিকে দিকে যেন প্রকটিত উন্নত সুন্দর দেবতা হৃদয়!

এঁরা বুঝতে শিখেছে, এঁদের মানুষের মত বাঁচতে হবে, এর চেয়ে প্রাণ রাখা বড় কথা নয়। আর কেউই চায় না অত্যাচারিত হতে, সকলের মুখ সুবিচারের প্রতি, প্রত্যেকেরই একটা আন্তরিকতা দেখা দিয়েছে। হীন স্বার্থপরতা যেন বিদায় নিয়েছে। এই জন্যই কবি গেয়েছেন, 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!' কার ইঙ্গিতে যেন এঁরা 'মানুষ" হয়েছে। এই যে এক প্রাণতা, এও ভগবানের ইঙ্গিত। যাঁর ইঙ্গিতে বিশ্বচরাচর চলে, তিনিই প্রয়োজনবোধে মানব হৃদয়ে দেবভাব জাগরিত করে থাকেন, সাহেবদের অত্যাচার নিবারণ কল্পে শ্রীভগবান্ নিজেই এইসব কাজ সমাধা করেছেন। আমার একটি মুখের কথা শোনা মাত্র সবাই সে কথা পালন করতে ছোটে।

যথাসময়ে শিকারপুরে হরেনদা ও বৌদিকে প্রণাম জানালাম। তাঁরা

উভয়ে আমাকে আশিস দিলেন। ওঁদের একটি পুত্র সন্তান ইতিমধ্যে জন্মেছে, (আমি প্রায় সাত মাস কাল শিকারপুর ছাড়া) তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা জানতাম না, তাঁর ছেলের নাম তিনি রেখেছেন 'সোমনাথ'। অধিকাংশ সময় তিনি আমাকে 'সোমনাথ' নামেই ডাকতেন। আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ও সেই ভালবাসাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই, পুত্রের নামকরণে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমঋণ কণামাত্রও শোধ করতে পারি নি। কয়েকদিন ঐ অঞ্চলে ঘুরে ধাপাড়ীতে ঘনশ্যামদার ওখানে সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, সেখান হতে লালপুর থানায় নূরুল হকের কাছে হাজির হলাম।

নূরুল হক তখন দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁরা বলাবলি করছেন সে কথার সারমর্ম মোটামুটি এই যে, সোমেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কুড়ি বাইশ মাইল ঘুরেও দুই মাসের মধ্যে সাক্ষী পাওয়া যায় নি একটিও যে সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সবাই দেখি তাকে ভালবাসে, লোকটার প্রভাব খুব বেশী! আমি তাঁদের বললাম, "মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার লোক পাওয়া যাবে না, সত্য সাক্ষী ঠিকই পাওয়া যাবে।" ওদের মধ্যে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "লোক পেলে তবে তো সত্য মিথ্যা যা হোক শেখাবো, মূলেই যে পাওয়া যাচ্ছে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "পোষাক ও বয়স দেখে মনে হচ্ছে আপনিই যেন সোমেশ্বরবাবু। মশাইয়ের নাম কি?"

জানালাম "আপনার অনুমান সত্য, আমিই সোমেশ্বর।" দু-তিন দিন পরে মামলার দিন ছিল, একদিন লালপুর থানায় থেকে রাজসাহী রওনা হলাম।

ঠিকসময়ে রাজসাহী উপস্থিত হয়ে উকিল মিঃ দাশগুপ্ত মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, তিনি বললেন আজই বোধহয় মামলার বিচার শেষ হবে।

একজন মুসলিম এস্, ডি, ও ভদ্রলোক কর্তৃক আমার মামলার বিচার হল। আমার বিরুদ্ধে একশো সাত ধারা অর্থাৎ শান্তিভঙ্গের মামলা এনেছেন গবর্ণমেণ্ট, কোনই প্রকৃত সাক্ষী নেই, পুলিশ কর্মচারী চৌকিদার, সাহেবদের দু-একজন কর্মচারী ও বরকন্দাজ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করলাম না।

বিচারের মধ্য সময়ে Mr Reed এসে এস্, ডি, ও-কে বলে গেলেন "one

year G, I।” এস্, ডি, ও ভদ্রলোক আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, “সোমেশ্বরবাবু! বুঝতেই পারছেন আমি অসহায়, বিচারের প্রহসন করেই আপনাকে এক বছর বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে হলো।” আদালতগৃহ ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। এই মামলার বিচার দেখার জন্য বড় বড় উকিলগণ ও সাধারণ দর্শকগণ সকলেই বুঝলেন যে বিনা সাক্ষিতেই আমার মামলার বিচার হয়ে গেল। যাই হোক, যথাসময়ে আমাকে পুনরায় জেলে নিয়ে যাওয়া হলো, পূর্বমত সেই নির্দিষ্ট সেলেই আশ্রয় পেলাম।

দিন পাঁচ-ছয় পরে শুনলাম জাফরুদ্দীনকে জেল দেওয়া হয়েছে। জাফরুদ্দীন নরেনবাবুর সেলের একটি সেল পরেই স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ সময়েই (বেলা দ্বিপ্রহরে যখন কয়েদীরা একটু বিশ্রাম পায়) নরেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হতো, তিনিই আমাকে জাফরুদ্দীনের জেল হওয়ার কথা জানালেন। জেলে দুপুরে ভাত খাওয়ার এঁটো-ভুক্তাবশিষ্ট বাইরে ফেলার জন্য শেষের সেলটার সামনের কোণে একটা টিন দেওয়া ছিল; প্রতি সেলের কয়েদীদের জমাদার একে একে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে যায় ঐ টিনে উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল ফেলার জন্য। নিয়ম মত আমিও যেতাম। আমি একদিন নরেনদাকে উদ্দেশ্য করে জানালাম “নরেনদাদা, আপনাকে দেখার ইচ্ছে. কোন উপায় কি নেই?”

নরেনদা জানালেন “আমারও সেই ইচ্ছে, জেলের শাসন খুবই কঠোর, বলা যায় না, উপায় হবে কি না।” তার পরদিন দুপুরে হঠাৎ দেখি আমার সেলের আঙিনার কাঠের দরজা খুলে গেল এবং একজন বলিষ্ঠ খর্বাকৃতি কয়েদী একটি জাঙ্গিয়া ও হাতকাটা জেলের সার্ট পরে ক্ষিপ্র গতিতে আমার সেলের সামনে এসে নমস্কার দিয়ে বললেন, “আমিই তোমার নরেনদা। তোমাকে বয়সে প্রবীণ মনে করেছিলাম, কোন বয়স্ক নেতা ভেবেছিলাম। চললাম, আর না—হরদয়াল সিং-এর সঙ্গে আগামীকাল এঁটো ফেলার সময়—মনে থাকে যেন।”

তাঁকে দেখে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হল এ যেন বহুপ্রকার অত্যাচার সহ্য করেই সহনশীলতার মূর্তপ্রতীকরূপে বিদ্যমান, কেউ আর তাঁকে টলাতে পারবে না, কঠোরতাকে ধিক্কার দেবার জন্য তাঁর জন্ম! দেশমাতার ‘শৃঙ্খল বেদনা’ স্পষ্টভাবেই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে, কি দেখলাম!

যেন 'দেবতাদর্শন' পেলাম। অন্ধকার জেলের মধ্যে ভয়াল হিংস্র পশুপ্রকৃতির মানুষই থাকে—কিন্তু একি! এযে মহামানব নিপীড়িত আত্মা! ভারতমাতার প্রকৃত সন্তান, পলে পলে আত্মবলি দিয়ে 'শক্তিমঠ' সৃজন করছেন! সেদিন হতে জেলের কঠোরতাও যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল। তার পরদিন সোমবার—এইদিন সিভিল সার্জন সাহেব মহোদয় যথাসময়ে জেলের কয়েদী পরিদর্শন করে থাকেন, আমার সেলেও তিনি এলেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপও করলেন। আলাপের মধ্যে তিনি আমাকে 'বণ্ড' সই করে কলেজে ফেরার কথাই বললেন। আমি তাঁকে অনুনয় সহকারে জানালাম "আমি তো বহুবার বলেছি, এবারও সেই একই উত্তর, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

সাহেব হতাশ হয়ে বললেন, "জেল যে কি জিনিস তা জান না, এবার জানবে জেল কি, আচ্ছা বিদায়।" তিনি চলে গেলেন, তাঁর কথায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না, তবে সেটা আন্তরিকতার ভান মাত্র কি না তাও বুঝলাম না। যদি তাঁর কথাগুলো ভান মাত্র হয় তবে ভাল 'কলা বিদ্যা' শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলতে হবে। যাইহোক তাঁর অনুরোধ না রাখতে পেরে আমিও আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলাম। এই সময়ে নরেনদা আমায় জানালেন 'সাহেবের চেষ্টাকে সুন্দর ভাবে ব্যাহত করা হয়েছে।' তাই শুনে আমার মনের দুর্বলতা মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হলো।

সেদিন দুপুরে তৃপ্তি করে খেতে পারলাম, আজ এই প্রথম দিন জেলের অখাদ্যগুলিকে পরম 'সুখাদ্য' বলে মনে করতে পারলাম। দুপুরে খাওয়ার পর 'এঁটো' ফেলতে গিয়ে ফেলার সময় দেখি একটি সেলের কাঠের দরজা খোলা রয়েছে, তার মধ্যে উজ্জ্বল রজত গিরিনিভ ও সুন্দর মুখ হরদয়াল সিং। কি সুন্দর তাঁর বদনমণ্ডল! সকল অভাব অভিযোগ ও অত্যাচার যেন তাঁর চরণে ভৃত্য! আমি সেই দেবতাকে প্রণাম জানালাম, তিনিও সহাস্যে আশীর্বাদ দিলেন এবং বললেন "সোমেশ্বর, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের চাইতেও ছোট! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বোধ হয় দেশ এবার জাগবে। ভয় নেই। সেলে ফিরে যাও, অন্যদিন দেখা হবে।" এই ঘটনার পর হতে জেল আমার কাছে মহিমময় স্থান বলেই মনে হতে লাগলো। কত মহাপুরুষ এই সব সেলে রয়েছেন, তাঁদের পদরেণু এই সেলে রয়েছে। প্রতিদিন সকালে জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সেলের ধূলিকণাকেও প্রণাম জানাতাম।

একদিন হঠাৎ আমার লক্ষ্য হলো যে আমার সেলে মেথর বা ভাত দেনেওলা বা কোন ওয়ার্ডার বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না বা আমার সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, মুখ দেখাতেও চায় না, নারাজ না ভীত! একটা বই চাইলেও পাওয়া যায় না। আমার লোহার গেটও প্রায় খোলা হয় না। তার পরদিন নরেনদা আমায় জানালেন, "সোমেশ্বর, তোমায় নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে।"

আমি—আমি তো বিনাশ্রম কয়েদী, তবে কেন এই নির্জন কারাবাস দেওয়া।

নরেনদা—এখানে নিয়মকানুন বা আইন বলতে কিছু নেই, শুধু সিভিল সার্জনের হুকুমই এখানে আইন ও বিচার।

কয়েকদিন পরে সিভিল সার্জন সাহেব আমার সেলে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন ভালো তো?"

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালো।—আমাকে কি নির্জন কারাবাসের আইনের অধীনে রাখা হয়েছে?

সাহেব—কে বললো?

আমি—একটা বই চাইলেও পাই না, সেলে এসেও কেউ কথা বলে না, আমার সেলের লোহার গেট প্রায় খোলাই হয় না, এর কারণ কি?

সাহেব—যদি বলি সেই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হচ্চে।

আমি—আমার তাতে আপত্তি কি হতে পারে, তবে আমার নিজস্ব টিকিটে সেকথা আপনি কিছু লিখে দেন নি, অথচ আমার ওপর এ রকম শাস্তির ব্যবস্থা হলো কি করে?

সাহেব—আমার আদেশই যথেষ্ট!

আমি—তবে আপনি আমার টিকিটে লিখে দিতে বাধ্য, যে এ রকম ব্যবস্থা করেছেন লিখতে বাধ্য আপনি।

সাহেব—লেখা না লেখা আমার ইচ্ছে। এ রাজ্য আমার। আমি এখানে যাই করি না কেন, জবাবদিহি করবার কিছু নেই।

আমি—তা হলে আমি বুঝবো কি—যে 'সুপারিন্টেনডেণ্ট্ সাহেব' ভীরু!

সাহেব—আমি ভীরু কি সাহসী তুমি যা খুশী ভাবতে পারো, কিন্তু আমি তোমার টিকিটে কিছু লিখবো না।

আমি—আপনি কেবল যে ভীরু, তা নয় কাপুরুষও বটে।

সাহেব—কি? কাপুরুষ?

আমি—নিশ্চয়ই।

সাহেব—যদি টিকিটই না দিই তো কি হবে?

আমি- এ রকম টিকিট দেওয়া না দেওয়া একই কথা। আপনি টিকিট নিয়ে যান, আমি আর টিকিটের কথা বলবো না, তবে আমার কাছে টিকিট থাকলেই টিকিটের কথা বলবো।

সাহেব রেগে সেল হতে চলে গেলেন। তার পরদিন হতে আমার বিষয়ে আরও কঠোরতা অবলম্বন করা হলো। সেই ছোট্ট সেলে সারাদিন আবদ্ধ থেকে শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, ঘরের মধ্যেই একটু এদিক ওদিক করা আর অলসভাবে ঘুমানো ভিন্ন অন্য কোনো কাজই নেই। মনে পড়ে ছোটবেলায় 'চিড়িয়াখানায়' গিয়ে খুব একটা বড় বাঘের খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে কত না অনুযোগ করেছিলাম বাঘটাকে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য। তখন বুঝি নি তার কি মনোবেদনা, বুঝছি এখন। নিজের বন্দীজীবনের মাঝে কি নির্মম জ্বালা, যার তাড়নায় নিজের অন্তস্থল পর্যন্ত ব্যাকুলভাবে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে! সে কি করে স্থির থাকবে?

প্রথম আট দশদিন আমার খুবই কষ্ট হলো,—পরে আমার সে কষ্টের একটু লাঘব হলো—কারণ আমি খেলা করার জন্য দু'দল পিঁপড়ে এবং ছোট্ট দুই তিনটি ইঁদুর পেলাম, দুই একটি চড়াই পাখীও আসতো, আমি তাদের জন্য ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতাম, যখন দেখতাম তারা এসে খাবার খুঁজছে তখন চার পাঁচটি ভাতকে চট্‌কে গুলি পাকিয়ে রাখতাম, তাদের দিকে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতাম, তাদের সঙ্গে খেলায় ভুলে আমার কষ্টের লাঘব হতো। এর পরও তেরদিন অর্থাৎ সবসুদ্ধ এক মাস তেরদিন আমার নির্জন কারাবাস ভোগের পর সিভিল সার্জন সাহেব এসে দেখা দিলেন। ইতিমধ্যে আরও দু' তিনবার তিনি এসেছিলেন। এদিন এসে আমায় বললেন "চৌধুরী তুমি জেলের কঠোরতম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছ, আর জেলে তোমার কিছুই হবে না, তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। মনে করেছিলাম, কঠোর শাস্তিতে ভয় পেয়ে 'বণ্ড' সই করবে, কিন্তু এখন দেখছি কিছু হবে না। কাজেই তোমাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বল এখন আমি তোমার কি উপকার করতে পারি। আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তুমি আমার কাছে কি চাও?"

আমি—সাহেব, যদি প্রকৃতই আমার কিছু উপকার করার ইচ্ছা থাকে তবে আমাকে কলকাতার বড় জেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করুন।

সাহেব তথাস্তু বলে আমার কাছে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। তার পরদিন হতে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হতে লাগলো। যে বইগুলি চেয়ে পাই নি সে বইগুলি একসঙ্গে এসে গেল। একখানি বই নিয়ে আমি বাকিগুলি ফেরত পাঠালাম। এর পর জেলে আর কোন গোলযোগ হয় নি, তবে রাজসাহী জেলে সে সময়ে যে ভাত দেওয়া হতো, তাহা কহতব্য নয়। ভাত 'কুলী রাইসের' সকল জেলেই হয়ে থাকে, এখানেও তাই! তরকারী বলতে—গাধা পুরুনের শাক (পুনর্নবা) দিয়ে পিঁয়াজকুচি মেশানো, তা মানুষের পক্ষে অখাদ্যই তবু সেটাও আমাদের সহ্য হয়েছিল। একটু ডাল ও পিঁয়াজকুচিই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। এত খারাপ খাদ্য আমি অন্য কোথাও খাই নি বা দেখি নি। যাই হোক কুড়ি, বাইশদিন পর রাত্রি দশটার সময়ে অনেকগুলি ওয়ার্ডার এলো। দূর হতে দেখলাম পর পর দুটি সেল খোলা হলো এবং কয়েদীদের বের করা হলো। তারপর আমার সেলও খোলা হলো। বড় জমাদার ডাক দিল, "সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী, আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি আমার সেই 'কাতার চেটাই', কম্বল চাদর, লোহার থালাবাটী নিয়ে বাইরে এলাম। অশ্বত্থতলায় এসে দেখলাম, নরেনদা ও জাফরুদ্দীন ভাইও দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নরেনদাকে প্রণাম দিতে যাচ্ছি বুঝে নরেনদা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলেন। যা হোক, আমাদের জেলগেটে নেওয়া হলো, সেখানে জমা খরচ যা করার ঠিক করে, তিনজনকে আর্মড পুলিশদের হাতে দেওয়া হলো। গেটের বাইরে তিনখানি মোটরবাস হাজির ছিল। সামনে ও পেছনে আর্মড পুলিশ বোঝাই বাস দুখানি। মাঝের বাসে আমাদের নেওয়া হলো। আমাদের বাসের মধ্যে আমরা তিনজন ও একজন সি. আই. ডি. অফিসার এবং জনাদশেক আর্মড পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাস চলতে লাগলো।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে শব্দ উঠতে লাগলো—'গান্ধী কী জয়!' 'দেশবন্ধু কী জয়!' 'বন্দেমাতরম্!' 'আল্লাহো আকবর!' সে রাত্রিতেও রাজসাহীর বহু নরনারী রাস্তার ধারে এসে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। রাজসাহী কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের সে কি বিদায় অভিনন্দন! আমাদের তিনখানি বাসই আধঘণ্টা আটক হয়ে যায়। সকলে সমস্বরে জয় জয় রবে শহরটিকেও মাতিয়ে তুলেছিল।

সি. আই. ডি. ভদ্রলোকের অনুরোধে আমি বাসের বাইরে এসে ছাত্রদের করজোড়ে অনুরোধ করলাম আমাদিকে ছেড়ে দেবার জন্য। জনতা ধীরে ধীরে সরে গেল। আমাদের বাস নাটোর অভিমুখে ছুটে চললো। ঠিক ভোরেই নাটোর পৌছুলাম। সেখানে অন্য সব আর্মড পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। তারা আমাদের নিয়ে স্টেশনে গেল এবং ট্রেন এলে সেই ট্রেনের (আমাদের তিনজনের জন্য দুটি বড় কামরা রিজার্ভ হয়ে এসেছিল) নির্দিষ্ট কামরায় তুলে ঐ আর্মড পুলিশ সঙ্গে চললো। স্টেশনে যেসব দর্শকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনির মধ্যে আমাদের বিদায় দিলেন। প্রতি স্টেশনে আমাদের চিৎকার ধ্বনিতে ভীড় জমে যেতো, ঈশ্বরদি স্টেশনে বেশী ভীড় জমেছিল। সেখানকার লোকে ধারণা করতে পারে নি যে জাএরুদ্দীন ভাই ও আমি সেই কামরায় আছি। আমাদের কণ্ঠস্বরের আভাস পাওয়া মাত্র জনতা 'জয় জয়' রবে চিৎকার সুরু করলো। বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার মধ্যে শিয়ালদহ পৌছুলাম। জেলের গাড়ী ও আর্মড পুলিশসহ চার-পাঁচ জন সার্জেণ্ট হাজির ছিল।

'গান্ধীজী কি জয়' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতেই বহু লোক আমাদের সঙ্গে চিৎকার শুরু করল। সার্জেণ্টরা আমাদের ট্রেন হতে নামিয়ে মোটরে তুলে নিল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে আমরা আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে এসে পৌছুলাম।

আমরা আমাদের সেই মূল্যবান্ আসবাবপত্র নিয়ে জেলে ঢুকলাম। আমাকে ও জাফরুদ্দীন ভাইকে দেওয়া হলো স্টেট প্রিজনার ওয়ার্ডে, নরেনদাকে অন্য ওয়ার্ডে দেওয়া হলো।

আমরা ওয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম, অযোধ্যাপ্রসাদ, জগদম্বাপ্রসাদ ও ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞা এবং শিবপুর ডাকাতির আসামী অনিলবাবু তখন পোষ্ট অফিসের 'অন্ হিজ্ ম্যাজিস্টিজ্ সার্ভিস' খাম তৈরী করে গাদা করেছেন। আমরা গিযে সকলের কাছে আলিঙ্গন ও সমাদর পেয়ে খুশী হলাম। তারপর আরম্ভ হল সেই পুরাতন কাহিনী। একই রকম সেই সকালে 'লপসী', দুপুরে ভাত, বিকেলে ভাত, তারপর সেল বন্ধ, এমনি চলতে লাগলো। নরেনদা যে ওয়ার্ডে ছিলেন সেখানে বোমা কেসের আসামীরা থাকতেন। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা যাতে না চলে সেজন্য গুর্খা পাহারা ও জাঠ পাহারাওয়ালাগণ। কিন্তু

দুঃখের বিষয় কয়েকদিন যেতে না যেতেই তারাও আমাদের ভক্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত নরেনদাদের ওয়ার্ডের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলার কোন অসুবিধাই রইল না। একটা কথা প্রকৃতই সত্য, যে ওঁদের প্ররোচনায় আমরা সকালে 'লপসী' খাওয়া (লপসী মানে খুদঘাঁটা) বন্ধ করলাম, দুদিন গোলযোগের পর তিনখানা রুটী ও একটু গুড় আসতে লাগলো লপসীর বদলে। জেলে তখন সপ্তাহে একদিন মাছ দেওয়ার নিয়ম ছিল, কতকগুলো লাউ কেটে কুচি করে তার সঙ্গে মাছ সিদ্ধ করে দেওয়া হলে যা হয়, এটা তারও অধম জাতীয়। একরকম মাছের গন্ধ ও মাছের সূক্ষ্ম পদার্থ ভাসমান একটি তরল পদার্থ! তার মাঝে মাঝে ঐ লাউ-এর কুচি, সেদিন কয়েদীদের আনন্দ! হঠাৎ একদিন নরেনদাদের ওয়ার্ডের কয়েদীরা সংবাদ দিলেন, 'ইলিশ মাছ ভাজা ভিন্ন যেন খাওয়া না হয়।' আমরাও সেই যুক্তি নিলাম, ফলে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হলো। দুদিন না খাওয়ার পর ইলিশ মাছ ভাজা পেলাম। দুই মাস এইভাবে কাটলো। হঠাৎ একদিন জেলে সার্জেন্ট এসে আমাকে জিনিসপত্র সমেত গেটে ডেকে নিয়ে গেল। সেখান হতে (পূর্বের মত আর্মড পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে) চুয়াডাঙ্গা থানার হাজতে নিয়ে গেল। সে রাত হাজতেই রাখা হল। শুনলাম আমার কেস্ (Case) হয়ে গেলেই আমাকে পুনরায় কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু হল অন্যরকম। বিচারক আর্গার সাহেব হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ায় আমার বিচারে দেরী হতে লাগলো। আমাকে থানা হতে জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

চুয়াডাঙ্গা জেল ছোট, সে সময় সেখানে ডাকাতি কেসের কয়েদী বেশী। আমাকে নিয়ে কর্মকর্তারা বিব্রত হতে লাগলেন। আমাকে কৃষ্ণনগর জেলে পাঠান হলো আর্মড পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে কৃষ্ণনগর স্টেশন, তথা হতে ঘোড়ার গাড়ীতে জেলে নেওয়া হলো। মাত্র তিনটি সেল---একটিতে মহাদেব কুর্মী, একজন পকেটমার, অন্যটিতে একজন পাগল, অপরটিতে আমি। জেলের সিভিল সার্জেন সাহেব আমাকে ভাল চোখেই দেখতে লাগলেন। আমি একদিন ইচ্ছে করেই কাজ চাইলাম, তিনি আমাকে সাড়ে সাত সের গম পিষতে দিলেন। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কোনরকমে পেষাই করে চতুর্থদিন হাতের যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম। সিভিল সার্জন সাহেব আমাকে জানালেন, "আর চেষ্টা করা যাবে না। আপনাকে ঐ কাজ করতেই হবে।" আমিও করতে চাইলাম।

কিন্তু পঞ্চম দিন হতে গম আর এলো না, সিভিল সার্জন সাহেব জানালেন "আপনাকে কাজের অযোগ্য বোধে কাজ মকুফ করা হয়েছে।"

আমার পৌরুষ ও আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো, আমি বললাম "অন্য কোন কাজ থাকে তাই দিন।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন "তবে ঘানি আছে, তাতে কিন্তু সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে কাজ করতে হবে। তা না হলে আপনাকে ঘানিতেই দিতাম। আপনাকে দেবার মত কোন কাজ এখন নেই, আপনি বসেই থাকুন।"

আঠাশদিন কৃষ্ণনগরে থাকার পর আমাকে পুনরায় চুয়াডাঙ্গা নিয়ে যাওয়া হলো। এবার জেলেই স্থান পেলাম, পরদিন প্রাতে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে জেলে দেখতে এসে নিমন্ত্র করে গেলেন। দুপুরে নানা রকম খাদ্য আমার কাছে পৌছুলো। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম আর্থার সাহেব ভয়ানক পীড়িত, আমার বিচারের জন্য তাহাকেই পাঠানো হয়েছে। এর পরদিন আমার বিচার হবে। বিচারক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যাই হোক, যথাসময়ে বিচারালয়ে নীত হলাম। লোকের ভীড় দেখে আর্মড পুলিশ পাহারা নিযুক্ত হলো। কোর্টের চারদিকে জনতা মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্', 'গান্ধীজী কী জয়', 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো।

মজার কথা আসামী হাজির কিন্তু সাক্ষী কই। মেহেরপুরের এস্. ডি. ও. নদীয়ার জেলা ইঞ্জিনিয়ার ও হোগলবেড়িয়ার চৌকিদার এই তিনজন মাত্র সাক্ষী।

প্রথম সাক্ষী S. D. O. গিয়ে বিচারকের পাশে বসলেন। বিচারক তখন আমাকে বার বার বললেন "আপনি কিছু বলবেন কিনা? কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি না?" আমি বিচারককে জিজ্ঞাসা করলাম "আমার বিচারক কে? আপনি না উনি?"

বিচারক—আমিই বিচারক এবং ইনি সাক্ষী।

আমি—সাক্ষীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে হলপ পাঠ করানো আপনার কর্তব্য। উনি ওখানে কেন? আপনার বাংলোয় গেলে আপনার পাশে বসতে পারেন, এখন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

আমার কথায় আদালতসুদ্ধ লোক হাসি ও মৃদু গুঞ্জন করতে লাগলেন, মাথা নীচু করে এস্. ডি. ও. সাহেব কাঠগড়ায় উঠে এলে তাকে সত্য পাঠ করানো হলো। এঁর বিষয় এই পর্যন্ত।

তারপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—তিনি ম্যাপ ও স্কেল ধরে প্রমাণ করতে এসেছেন যে, হোগলবেড়িয়ার মাঠটি শিকারপুরকে কেন্দ্র করে তিন মাইল রেডিয়াস ধরলে, ঐ বৃত্তের মধ্যেই পড়ে, তাহলে আমার ১৪৪ ধারার নোটীশ ভঙ্গ করা হয় ও ১৮৮ ধারায় অপরাধ প্রমাণ হয়।

বিচারক আমাকে বার বার বলতে লাগলেন "আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন কিম্বা জিজ্ঞাসা করতে চান তো করুন!" আমার খুব কৌতূহল হলো, আমি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন্দ্র কাকে বলে?" তিনি ঢোক গিলে 'তা হলো—" বলে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেন।

আমি—কেন্দ্র বলতে কি বোঝায়?

ইঞ্জিনিয়ার—একটি বিন্দু।

আমি—শিকারপুর কি একটি বিন্দু?

ইঞ্জিনিয়ার—শিকারপুর একটি বড় গ্রাম। দৈর্ঘ্যে তিন মাইল, প্রস্থে প্রায় দেড় মাইল।

আমি—তা হলে জিজ্ঞাসা করি, ঐ গ্রামটির পরিধি হতে না মধ্যস্থল হতে আপনি প্রশ্নের কেন্দ্রটিকে ধরবেন?

ইঞ্জিনিয়ার—আমি ম্যাপের শিকারপুর চিহ্নিত যে গোল দাগটি আছে, তার কেন্দ্র থেকে ধরছি।

আমি—তা হলে দয়া করে বিচারক মশাইকে ঠিক হলপ করে বলুন যে প্রকৃত শিকারপুরের মধ্যস্থল হতে তিন মাইল রেডিয়াস মেপে নির্ভুলভাবে আপনি জেনেছেন যে হোগলবেড়িয়া তিন মাইল মধ্যে?

ইঞ্জিনিয়ার—ম্যাপদৃষ্টে তাই হয়।

আমি—আপনার Scale Calculation কত?

ইঞ্জিনিয়ার—তা তো করা হয় নি।

আমি—এক মিলিমিটার যদি কম বেশী হয় তা হলে কত রাস্তার তফাৎ হবে?

ইঞ্জিনিয়ার মশাই আমতা আমতা করে বললেন "অনেক তফাৎ হবে।"

আমি—আমার আর কোন বক্তব্য নেই আপনি কাঠগড়া হতে নেমে যেতে পারেন।

এরপর হোগলবেড়িয়ার চৌকিদারকে হাজির করা হলো। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলতে লাগলো—"উনি তো কিছু খারাপ কথা বলেন নি।"

আমি—কি বলেছি মনে আছে কি ?

চৌকিদার—তুলা কর, চরকা কর, কংগ্রেসের সভ্য হও, অন্যের অত্যাচার সইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি !

সরকারী উকিল—সকলকে ধর্মঘট করে নীলের কাজ বন্ধ করতে বলেছিলেন কি না ?

চৌকিদার—উনি ওখানে সভা করার আগেই ধর্মঘট হয়েছিল, আমি থানাতে খবর দিয়েছিলাম।

উকিলবাবু ও পুলিশের লোক চৌকিদারকে দিয়ে কিছুই প্রমাণ করাতে পারলেন না, শেষে উকিলবাবু চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলেন "সোমেশ্বরবাবু কোন সভা করেছিলেন কি না, তোমাদের হোগলবেড়িয়ার মাঠে ?"

চৌকিদার—আজ্ঞে হ্যাঁ, অতবড় সভা ও লোক জমায়েত আমি আমার জীবনে দেখি নি।

আমি—হ্যাঁ ভাই, সেই মাঠটি, যেখানে সভা হয়েছিল—শিকারপুর হতে কতদূর ?

চৌকিদার—ছোটবেলা হতে আমরা মাঠে চাষ করতে গেলে দু-ক্রোশের বেশী, আর সরকারী জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়ে গেলে আড়াই ক্রোশ হবে।

আমার বিচারের প্রহসন শেষ হলো। বিচারক মশাই আমাকে জানালেন "আপনি এখন যেতে পারেন, মামলার রায় আজ দেবো না।" আমাকে পুনরায় জেলে নেওয়া হলো। পরদিন পুনরায় আমাকে আদালতে নিয়ে গিয়ে জানানো হলো, ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আমি নমস্কার করে বিদায় নিলাম। জনতা আজও কম নয়, বিকেলে পুনরায় জেলে নেওয়া হলো। সেদিন রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে কৃষ্ণনগর জেলে পাঠানো হলো। কৃষ্ণনগর হতে পনের ষোলদিন পর আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে যথানিয়মে বার ডিক্রির ওয়ার্ডে স্থান পেলাম। তখন বহু স্বদেশী কয়েদী এখানে আছেন, এখন আর ঠিকমত সকলের নাম মনে নেই, মুখ হয় তো অনেকেরই মনে পড়ে। বরিশালের নেতা শরৎচন্দ্র ঘোষ, দার্জিলিং-এর নেতা দলবাহাদুর গিরি, মৌলভী শামসুদ্দিন আহাম্মদ, সুরেশ নামে ফরিদপুরের একজন স্বেচ্ছাসেবক ও আরও চার পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবক চট্টগ্রামের, আবদুল কাদের বলে একজনের নাম বিশেষভাবেই মনে পড়ে। চট্টগ্রামের কয়জন

রাত্রিতে আমাদের ওয়ার্ডে থাকতেন এবং ভোর হলেই ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে (যেখানে দেশপূজ্য নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত থাকতেন) চলে যেতেন। কিছুদিন পর মৌলভী শামসুদ্দীন আমেদ ভাইও দিনের বেলায় যাওয়া আসা আরম্ভ করেন।

তখনও আমরা 'সরকার সেলাম' বললে সেলাম দিতাম, কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা তর্কের ও অসন্তোষের সৃষ্টি হতো, কিন্তু শরৎবাবুকে আমরা সবাই ভক্তি করতাম, তাঁর কথার বাইরে আমরা যেতাম না। যেদিন দলবাহাদুর গিরি আমাদের ওয়ার্ডে আসেন সেদিন হতে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি দল গড়ে উঠতে লাগলো। একদিন দলবাহাদুর গিরি দৃপ্তকণ্ঠে প্রচার করলেন "না, কথনই সরকার সেলাম করা হবে না।" সেদিনই তিনি তা বন্ধ করলেন কিন্তু অন্য সকলেই সেলাম দেওয়ার জন্য তাঁর সেলাম বন্ধের ব্যাপারে কোন গোলমাল হলো না। এই নিয়ে বহু তর্ক ও যুক্তি চলতে লাগলো, কিন্তু প্রিয়বন্ধু দলবাহাদুর গিরি অটলভাবেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে সেলাম বন্ধ করেই চলতে লাগলেন।

এরপর সোমবার দিন সিভিল সার্জেন অর্থাৎ সুপারিন্টেনডেণ্ট্ কর্ণেল অ্যাস্ যখন আমাদের ওয়ার্ডে এলেন, তখন একযোগে সবাই সেলাম বন্ধ করলাম, কর্ণেল অ্যাস্ সেটা আদায় করার জন্য খুবই চেষ্টা করলেন, ফলে 'পাগলা ঘণ্টি' পড়লো। আমাদের সেলে বন্ধ করে রাখা হলো। জেলের ভেতরে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল—'সেলাম' বন্ধ হবে কিনা এই নিয়ে, কিন্তু সেলাম বন্ধ হয়ে গেল। দু'দিন ডিক্রি বন্ধ থাকবার পর সেটা মকুফ হয়ে গেল।

প্রতিদিন আমাদের ওয়ার্ড হতে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে লোক যাতায়াত নিয়ে গোলমাল হতো, বোধ হয় মাত্র পাঁচজনের যাতায়াতের হুকুম ছিল কিন্তু আরও দুই তিনজন লোক যাতায়াত করতেন, তন্মধ্যে শামসুদ্দিন ভাইয়ের যাতায়াতের অধিকার জন্মেছিল। হঠাৎ একদিন এক জাঠ ওয়ার্ডার (আমাদের ওয়ার্ডে পাহারায় নিযুক্ত ছিল) ঠিক পাঁচজন গুন্তি করে ছেড়ে দিল,—শামসুদ্দিন ভাইকে আটক করলো, যেতে দিল না। এই নিয়ে শামসুদ্দিন ভায়ের সঙ্গে ঐ জাঠের বচসা হয়। ফলে শামসুদ্দিন ভাইকে সে অপমানসূচক কথা বলে। এই দেখে শরৎবাবু জাঠকে বললেন "তুম্ কাহে এ্যায়সা কিয়া? বাবুকো জানে নেহি দেতা?" এ নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গেও জাঠ অসভ্য ব্যবহার করলো। আমার রাগ হওয়াতে আমি শামসুদ্দিন ভাইকে জোর করে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ঠেলে দিই,

(তখনও আমাদের ওয়ার্ডের গেট বন্ধ হয় নি, শামসুদ্দিন ভাই সেই গেটটি ধরেই দাঁড়িয়েছিলেন)। জাঠ ওয়ার্ডার পাগলের মত আমাকে একটা ধাক্কা দিল। সেণ্টার টাওয়ারের ওপর যে পাহারায় ছিল সে তখন ঐ জাঠকে বলছে শুনলাম, "স্বদেশী লোক কা সাথ্ গোলমাল মৎ করো।"

জাঠ তার কথায় কান না দিয়ে আমাকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করলো, তখন আমি তাকে "উল্লু, জেলকা কুত্তা! তোমারা যো কুছ্ করনা হ্যায় তুম্ করো।" আমি তার সামনে রুখে দাঁড়াতেই সে বললো "হাম এলার্ম বাজায় গা।" "বাজাও" বলে আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে—সে যেই বাঁশীটি মুখে দিয়েছে আমিও অমনি তার শ্বাসনালীটি চেপে ধরলাম। ফলে বাঁশী বাজলো না কিন্তু এই অবস্থা হতে মুক্তি পাবার জন্য ঐ জাঠ বহু চেষ্টা করেও মুক্তি পেল না, তখন তার শ্বাসরোধের উপক্রম দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিতেই বাঁশীটি বেজে উঠলো, মুহূর্তমধ্যে ঘোররবে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো; দেখতে দেখতে লগুড় (ছোট লাঠি) হাতে নিয়ে বহু সিপাহী এসে আমাদের মৃদু-মধুর ধাক্কা দিতে ও কাউকে লাঠির গুঁতো দিতে আরম্ভ করেছিল, সেই সময়ে জে. এম্. সেনগুপ্ত মশাই ও মিঃ অ্যাস্ এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আগেই জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছিল?" যা ঘটনা ঘটেছিল তাই যথাযথ বর্ণণা করলাম, ঐ জাঠদ্বারা ধাক্কা খেয়ে আমার খুবই রাগ হয়েছিল, ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দেবার লোভও সংবরণ করতে না পেরে 'জেলকুত্তা' বলে গাল দিয়েছি ও শামসুদ্দিন ভাইকে বার করে দিয়েছি।"

মিঃ অ্যাস্—what do you mean by 'জেল কা কুত্তা।'

আমি—জেল কা কুত্তা মানে, জেল কা কুত্তা! you should understand because you are also in Service of this Jail.

Colonel Ash—Do you mean to say that I am also 'জেলকুত্তা'?

আমি—Of course, why not? If you behave like a dog with the prisoners of the Jail?

মিঃ অ্যাস্—"সেল বন্ধ করো, সেল বন্ধ করো" বলে চেঁচালেন।

আমরা সকলেই সেলে বন্ধ হলাম। সেনগুপ্ত ও মিঃ অ্যাস্ ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে চলে গেলেন।

তার পরদিন হতে আমাদের ওয়ার্ডের যার খুশী ইয়োরোপিয়ান ওয়ার্ডে যাতায়াত করতে পারতো, কেউ বাধা দিত না, আমি কিন্তু আমার ওয়ার্ড ছেড়ে যেতাম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পর আমাদের ওপর হুকুম জারী করা হলো মাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার পায়খানা যাওয়া চলবে। আমাদের বার ডিক্রির ওয়ার্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, আমরা যে ভাগে থাকতাম তা একটি দরজার দ্বারা প্রধান ওয়ার্ডটির সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ দরজা বন্ধ করলেই আমরা প্রধান ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণ ও সেলগুলির হতে আমরা পৃথক হয়ে থাকতাম। প্রথম প্রথম ঐ দরজা বন্ধই থাকতো, আমাদের নিজ নিজ সেলেই মলমূত্র ত্যাগ করতে হতো। পরে প্রধান ওয়ার্ডের শিরিষগাছ তলায় একটি পায়খানায় আমাদের সকলের দিনেরবেলায় মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ কারণে যতবার যে পায়খানা যাক না কেন ওয়ার্ডারকে দরজা খুলতে হতো। এজন্য হোক বা সাধারণ সব কয়েদীদের নিয়ম পালন করানোর জন্যই হোক সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঐ দরজা খোলা রাখা হতো পরে হতো না। এজন্য আমাদের মধ্যে একটা গোল-যোগের সৃষ্টি হলো, কারন অনেকেই দুবার পায়খানা যেতেন। সাড়ে আটটার পর ওয়ার্ডার কিছুতেই দরজা খুলতো না। বলে কয়ে যখন ফল কিছু হলো না, তখন ফরিদপুরের স্বেচ্ছাসেবক সুরেশ বললো, "আগামীকাল সোমবার এর ব্যবস্থা করবো।" সোমবারদিন মিঃ অ্যাস্ আমাদের ওয়ার্ডে আসার দু'মিনিট আগে সুরেশ পায়খানা যাবার আশায় ওয়ার্ডারকে দরজা খোলার জন্য ধাক্কা দিতে লাগলো। ওয়ার্ডার জবাব দিল, "নেহি, কেওয়ারী নেহি খুলে গা।" "তব হাম হিয়াই টাট্টি জায়গা" বলে সুরেশ সেই দরজার সামনেই কাজ শেষ করতে প্রস্তুত। মিঃ অ্যাস্ ঠিক সেই সময়ে এসে ক্রোধভরে দরজায় পা দিয়েছেন। সুরেশ সশব্দে তার কাজ শেষ করে ফেলেছে—দরজার সামনে এক গামলা ময়লা, সুরেশ যেন এই অভিনয়ের জন্যই পেটের মধ্যে দু'দিন ধরে সঞ্চয় করে রেখেছিল। মিঃ অ্যাস্ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এই দৃশ্য দেখে। সুরেশকে সেলে বন্ধের হুকুম দিলেন। জল শৌচান্তে সুরেশ সেলের দিকে আগুয়ান হলে মিঃ অ্যাস্ দূর হতে সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাহে তুম এ্যায়সা কিয়া ?"

সুরেশ—টাট্টি লাগা তো কেয়া করেগা ? তোম্‌হারা ওয়ার্ডার কেয়ারী নেহি খোলেগা তো এ্যায়সাই হর রোজ হোগা।

অ্যাস্—ক্যায়সে হোগা হাম দেখেগা।

সুরেশ—ক্যা দেখেগা ? হামকো দে ওউর বদনপর জুলুম সকৃতা, টাট্টি ওপর কুছ্ এক্তিয়ার তুম্‌হারা নেহি চলেগা ? উস্‌কা মালিক হাম্ হ্যায় খোদ, যো খুস্ হাম্ এ্যায়সাই করেগা, কেওয়ারী খোলকে রাখো, কুছ্ গোলমাল নেহি হোগা। নেহি তো সমুচ্চা ওয়ার্ডকো হামলোক 'টাট্টিখানা' ব্যনাকে রাখেগা।

অ্যাস্—বেত লাগানেসে সব ঠিক হোগা।

সুরেশ—লাগাকে দেখিয়ে না—কেয়া হোতা হ্যায় সমুচ্চা জেলভর সবকই লোক টাট্টিখানা বানাকে রাখেগা, তব আচ্ছা হোগা।

রাগে অ্যাস্ সাহেব সুরেশকে বন্ধ করে দিয়ে দেখলেন যে আমাদের ওয়ার্ডের সমস্ত কয়েদীই নিজ নিজ সেলে ঢুকে বসেছেন। কাজ বন্ধ হয়ে গেল, (তখন আমরা পাটের কোষ্টা বাছাই কাজ করতাম) এই ব্যাপার দেখে মিঃ অ্যাস্ কি চিন্তা করলেন এবং রাগতভাবে চলে গেলেন। তার পরদিন দরজা খুলে দেওয়া হল এবং ঐদিন হতে আর সেই মাঝের দরজা বন্ধ হতো না।

বালক সুরেশের এই ব্যাপারটি আমি একটি ক্যারিকেচারে পরিণত করেছিলাম। শ্রীযুক্ত দাশ মশাই মিঃ অ্যাস্ এর অংশ অভিনয় দেখে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তেন। বলতেন "আর না, থাক।" কিন্তু পরমুহূর্তেই বলতেন, "সোমেশ্বর, অ্যাস্ কি করেছিলেন ?" পুনরায় দেখাতেই অমনি বালকের ন্যায় হাসতেন। প্রায়ই দেশবন্ধুর আদেশে দুই একটি হাসির গল্পের ক্যারিকেচার করতে হতো। অন্যে হয় তো আনন্দ অনুভব করতেন না, দেশবন্ধু আনন্দিত হতেন, তাঁর সেই বিমলহাস্যে জেলখানা যেন স্বর্গে পরিণত হতো। জেল তখন আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্র, যে সকল নেতৃবর্গের পদধূলিতে ভারতভূমি পবিত্র, বহুদূর হতে আনীত বহু মাননীয়, পূজনীয় নেতৃবর্গের একত্র সমাবেশ! তাঁদের সেবা করবার সৌভাগ্য লাভে আমি বড়ই পরিতৃপ্ত ছিলাম, আমাদের দিনগুলি খুবই আনন্দে কেটে যাচ্ছিল।

এই সময়ে ভিতরে ভিতরে অনেকেই আমাকে হিংসাও করতেন, যে সামান্য একজন স্বেচ্ছাসেবক, পিছনে বিলাতী ডিগ্রিও কিছু নেই অথচ সব নেতৃবর্গের প্রিয়পাত্র! কেউ কেউ এ নিয়ে নিজের নেতৃত্বের বড়াইও করতেন মনে আছে। এই দেখে বরিশালের ঘোষ মশাই একদিন বলেছিলেন "তোমরা কি জানবে সোমেশ্বরের মূল্য ? তোমাদের মত শখের খেয়ালে জেলে আসে নি, ও যে কাজ করে এসেছে, অনেকেই তা করে নি।"

অসহযোগের বজ্র নিনাদ তখন ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক কারাগৃহ পূর্ণ করতে লাগলো। নিউ সেণ্ট্রালের সাধারণ কয়েদী—কেবল আমাদের খাওয়া দাওয়ার কাজ চলে এরূপ সংখ্যায় রেখে বাকী কয়েদীকে অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করতে হলো। দেশবন্ধু প্রমুখ অনেক নেতাই তখন নিউ সেণ্ট্রালে বন্দী। সাধারণ কয়েদীরা উত্তেজিত হয়ে কাজ বন্ধ করে 'দেশবন্ধু কি জয়', 'গান্ধী কি জয়', 'বন্দে মাতরম্' রবে জেলকে কাপিয়ে তুলতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করে জেলের চারদিকে কামান ও গোরাপল্টন বসানো হলো।

মিঃ অ্যাস্ একদিন দেশবন্ধুকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন জেলের প্রতি ওয়ার্ড ঘুরে সকলকে শান্ত করেন এবং নিয়ম পালন করতে বলেন। এই ঘটনার পর হতেই জেলের ভিতরকার পরিচালনের মধ্যেই 'স্বদেশী' কয়েদীগণই প্রভুত্ব করতে লাগলেন।

প্রথমেই খাওয়া বিষয়ে কয়েদীদের সংখ্যা হিসেব করে তেল, নুন, ডাল, মাছ, তরিতরকারী আদায় হতে লাগলো। ফলে জেলের খাওয়াও বাড়ীর খাওয়ার সমপর্যায়ে পৌঁছুলো। মধ্যে মধ্যে স্বদেশী কয়েদীদের একটা করে সভা হতো। হাসি, গল্প, গান, ক্যারিকেচার, নানা দেশের সংবাদ বিষয়ে আলোচনা হতো। নদীয়ার ফণীবাবু একটি গান গাইতেন, সেটা সকলেই উপভোগ করতেন। দেশবন্ধু আমাকে আদর করে মাঝে মাঝে বলতেন, "এটি আমার সোমেশ্বর, কাঠবিড়ালী সাগর বেধেছে।" বরিশালের শরৎবাবুকে আমি জ্যেষ্ঠ তুল্যই ভক্তি করতাম। মাননীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশাই আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বীরভূমের সর্বজনমান্য জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, করাটিয়ার চাঁদ মিঞা, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ইত্যাদির কাছে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতাম। আবুল কালাম আজাদ সাহেব গীতার উর্দু তর্জমা রচনায় বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সময় কম ছিল, তবু তিনি নমাজের মূল কারণগুলি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পূজনীয় জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী আমায় খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ও খেলা করেও আমার বহু সময় কাটতো। তিনি তখন জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করতেন ও আমাদিকে বহু উপদেশ দিতেন।

হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়; স্পেশাল ক্লাস ও সাধারণ রাজনৈতিক কয়েদীদের বিভাগ নিয়ে। যাই হোক নিউ সেণ্ট্রালে বিশেষ গোলমাল হয় নি। অবশেষে নিউ সেণ্ট্রালের সকল কয়েদীকে স্পেশাল ক্লাস কয়েদী বলে স্বীকার করা হলো। অতঃপর চেষ্টা চলতে লাগলো, রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় রেখে বাকী সকলকে চারদিকে সরিয়ে দেবার।

আমার হাতে ফোড়া হওয়ায় আমি হাসপাতালে পড়লাম। জেল হাসপাতাল হিসাবে নিউ সেণ্ট্রালের হাসপাতাল খুব ভালো। কর্নেল সুরেশ ব্যানার্জীও তখন সেখানে ছিলেন জ্বরে পীড়িত। হাসপাতালের বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল জেলের গোশালা। গোশালায় রয়েছে ভাল ভাল সুলতান গাই, ভাগলপুরী গাই। রয়েছে দার্জিলিং-এর বৃষ। কিন্তু হাসপাতালে দুধ সেরূপ পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। কর্নেল ব্যানার্জী মিঃ অ্যাস্‌-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন, আগামীকাল গোশালা দেখতে কর্নেল ব্যানার্জী প্রমুখ জন কয়েক যাবেন।

পরদিন প্রাতে গাভী দোহনের আগেই গোশালায় যাওয়া হলো এবং দেখা গেল, একটি একটি করে বড় ঘটি ও মিল্কক্যান আসতে লাগলো। ভিতরে বসেই সকলগুলি পাত্রেই নাম লিখে রাখা হলো, মিঃ অ্যাস্‌-এর আরদালীও মিল্কক্যান এনেছে, গুনতি করে দেখলাম সর্বসমেত ৬০টি পাত্র জমায়েত হয়েছে। সকলেই দুধের জন্য তাড়াতাড়ি করতে লাগলো, সকলকেই বলা হলো একটু দেরী হবে। বেলা সাড়ে দশটা প্রায় বাজে। মিঃ অ্যাস্‌ এসে উপস্থিত হলেন যখন তখন কর্নেল ব্যানার্জী- দুধের ঘটী ও ক্যান নিয়ে ব্যস্ত! তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সব ব্যাপার। মিঃ অ্যাস্‌ তাঁর আরদালীকে অযথা অপমান করে দূর করে দিলেন এবং সকলেরই ঐ অবস্থা হলো।

সেদিন হতে এত দুধ দই হ'তে লাগলো যে সাধারণ কয়েদীরাও দুধ পেতে লাগলো। আরও কয়েকদিন পর আমার হাতের ফোড়া ভাল হয়ে যাওয়াতে আমি ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। এর কিছুদিন পরে নিউ সেণ্ট্রাল হতে ৪৫ জন কয়েদীসহ আমাকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

আমাদের দলে বাঘাপাঁড়ে পালোয়ান ও তার দুজন শিষ্যকেও ঐসঙ্গে আনা হয়েছিল। 'বাঘা' আমাকে খুবই স্নেহ করতো। দেশবন্ধুর আদেশমত 'বাঘা' আমার আদেশ মানতে প্রতিশ্রুত ছিল। মেদনীপুর, ফরিদপুর,

চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হতে বহু স্বদেশী নেতা ও স্বেচ্ছাসেবক পূর্বেই এখানে এসেছেন। জেলের ভেতর যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদিকে অভ্যর্থনা করে জেলের মধ্যে গ্রহণ করলেন। খিলাফৎ ভলেন্টিয়ারগণ তাঁদের ইউনিয়ন সমেত সামরিক কায়দায় আমাদিকে সেলাম দিলেন। মনে বড় আনন্দ হলো, ভাবলাম এ রকম বায়ু পরিবর্তন মন্দ নয়!

দিন কাটতে লাগলো। প্রথমেই একটা গোলযোগ বাধলো, রাজনৈতিক কয়েদীদের স্পেশাল ও সাধারণ ক্লাস নিয়ে। যে ৪৫ জন নিউ সেণ্ট্রাল জেল হতে এসেছি, সকলেই স্পেশাল ক্লাসে ছিলাম, কিন্তু অন্য জায়গা হতে যারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে ২১ জন বাদে সকলেই সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী। প্রথমেই খাট ও বিছানা নিয়ে গোল বাধলো।

অনেকের স্মরণ থাকতে পারে, বহরমপুরে ফিমেল-জেল হবার কথা ছিল। এ জন্য ভাল লোহার খাট গদী মশারী তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ জিনিষগুলি জেল গুদামে মজুদ ছিল। যে সকল স্পেশাল শ্রেণী কয়েদী এসেছেন, তাঁদের ঐ সব দেওয়া হতে লাগলো। কিন্তু সাধারণ কয়েদীকে তাঁরা সেগুলি দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে সাধারণ স্বদেশী কয়েদীরা একদিন ওয়ার্ডে ঢুকতে অস্বীকার করলেন ও জেলের ভিতরকার মাঠে বসে 'বন্দেমাতরম্' 'গান্ধী কি জয়' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে লাগলেন। রাত্রি ৮টায় পাগলা ঘণ্টি বাজলো। জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট বা সিভিল সার্জন— Mr. Hague সাহেব ক্রমে আমাদিকে অনুরোধ করলেন ওয়ার্ডে প্রবেশ করার জন্য। আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করলাম যে যত জন খাট গদী মশারী পাবেন না, গভর্নমেণ্ট হতে তাদের অন্ততঃ মশারী দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন হলে দোতলার মেঝেতে বিছানা পেতে থাকতে দেওয়া হবে, তবে সাধারণ কয়েদীর প্রাপ্য সবই তাঁরা পাবেন। এই সর্তে ওয়ার্ডে যাওয়া হলো।

পরদিন গুদামে যা ছিল সবই দেওয়া হয়েছিল, ফলে প্রায় সবাই স্পেশাল শ্রেণীর বিছানাই পেয়েছিলেন। পুনরায় খাওয়া নিয়ে গোল বাধলো। একদল খাবেন সাধারণ কয়েদীর খাদ্য তালিকামত, আর একদল খাবেন প্রথম শ্রেণীর খোরাকী অর্থাৎ ভাল খাওয়া, তা কি করে হতে পারে?

আমরাও সাধারণ শ্রেণীর খাওয়া খেতে লাগলাম কিন্তু এ নিয়ে গোল

বাধলো। ডি. এম. এসে একটা বন্দোবস্ত করে গেলেন। তিনি বললেন "আমার এখানে স্পেশাল বা অর্ডিনারী কিছুই নেই, যতগুলি স্পেশাল ও অর্ডিনারী শ্রেণীর আছেন, মাথাপিছু খরচের টাকা একত্র করে যে রকম খাওয়া সম্ভব হবে, তাই আপনারা পাবেন। এতে কারো কিছু বলার থাকবে না।"

Mr. Adu—জেলা শাসক মহোদয় ইংরেজ হলেও খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিও বটেন। তিনি ননকোঅপারেশনের সঙ্গে কো-অপারেশন করে ছিলেন। স্বদেশী গান কিম্বা মিছিল বের হলে তিনি নিজেও পুরোভাগে যোগদান করতেন, কাজেই তাঁর এলাকায় আন্দোলন ঘুমিয়ে থাকলো।

আমরা বহরমপুর আসার কয়েকদিন পরই Mr. Adu একদিন জেলে এসে "সোমেশ্বর চৌধুরী কোথায়?" বলে অনুসন্ধান করেন। ফরিদপুরের যামিনীবাবু এসে ওয়ার্ডের ভেতর হতে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। Mr. Adu আমাকে দেখে বললেন, "সোমেশ্বর, সোমেশ্বর শুনে শুনে বড়ই বিরক্ত হয়েছি, তাই দেখতে এলাম সোমেশ্বর কেমন এবং কিরূপ নেতা।" আমি উত্তর দিলাম "নেতা আমি নই, স্বেচ্ছাসেবক মাত্র।"

Mr. Adu—যাই হোক, আমি দেখছি পুলিশ সোমেশ্বর সম্বন্ধে যতটা উদ্বিগ্ন, বড় বড় নেতাদের সম্বন্ধে ততটা উদ্বিগ্ন নন। পুলিশ রিপোর্টে সোমেশ্বর বিষয়ে সবই জেনেছি। আমার আদালতেও সোমেশ্বরের নামে পুলিশ case এনেছে। আমি নিজে পুলিশকে ঐ কেশ তুলে নিতে বলেছি। সেই জন্যই সোমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা।"

বহরমপুরের জেলের ভেতর প্রাঙ্গণে একটা বট ও একটি অশ্বত্থ গাছ পাশাপাশি আছে, ঐ গাছ তলায় একটা চেয়ারে বসেই Mr. Adu আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে বললেন "আমি একজন উকিল কিম্বা ডাক্তার কিম্বা বড় একজন ব্যক্তিকে দেখতে এসেছিলাম, দেখলাম একজন যুবক ছাত্রকে।"

আমি—কেন সাহেব! আমাকে পছন্দ হলো না। আমি বয়োবৃদ্ধ কিম্বা উকিল ডাক্তার হলে পছন্দ করতেন। জগতের ইতিহাসে যত নেতার পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা সকলেই কি বয়োবৃদ্ধ উকিল ডাক্তার?

Mr. Adu—সোমেশ্বর সম্বন্ধে যা জানার তা পুলিশের কৃপায় ঘরে বসেই পেয়েছি। সোমেশ্বর সম্বন্ধে যা জেনেছি, সোমেশ্বর নিজেও তা বোধহয় জানে না।

হাসতে হাসতে সাহেব বললেন "এই ক্ষুদ্র নেতাটিকে নিজ চোখে দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরেই দেখতে এসেছি। আমার এক্ষণে সোমেশ্বরকে বক্তব্য এই যে আমার জেলায় কোন কেস কারো নামে নেই। জলঙ্গী সাব ডিভিসন হতে এই সোমেশ্বরের নামে একটি, আর একজনকে দু-তিন দিন পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছে। এই দুইটি মাত্র কেস বিচারাধীন, আমি কি করতে পারি সোমেশ্বরকে জিজ্ঞাস্য।"

আমি—আপনি যা খুশী তাই করতে পারেন। ইচ্ছা হয় রাজসাহী ও নদীয়ার মত, মুর্শিদাবাদেও আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার হয়তো Mr, Adu সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে সব কেসই উঠিয়ে নিতে পুলিশকে আদেশ দিতে পারেন। Mr. Adu যা বুঝবেন তাই করবেন।

আমার কথায় হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে Mr. Adu আমাকে বললেন, "পুলিশের রিপোর্ট ও কেসের গুরুত্ব আরোপ যেরূপ, তাতে সোমেশ্বরকে শাস্তি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন। কিন্তু আজ সোমেশ্বরকে দেখে মনে হচ্ছে কেস না করাই ভাল। যাই হোক পরে জানাবো।

অনান্য নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি জেল হতে চলে গেলেন। বহরমপুর জেলটি বেলফুলের জন্য আমার কাছে খুবই মনোরম মনে হতো। ভোরে স্নান সেরে বেলফুল তুলে গীতাপাঠ ও ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেওয়া ছিল আমার নিত্যকর্ম। জেলবাড়ীর সমুখ প্রাঙ্গণে ও রাস্তার দুধারে বেল ও যুইগাছের সারি দেওয়া। সকাল সন্ধ্যায় ফুলের সৌরভে তখন সমস্ত জেলটি সুরভিত করে রাখতো। জেলবাড়ীর ভেতরে দুটী 'রবারগাছ' শ্যামল শোভায় নয়নে শান্তি এনে দিত। জেলের সুউচ্চ পাঁচীলের বাইরে রাস্তা এবং ওধারে বাঁধ। বাঁধের ওদিকে প্রবাহ মানা গঙ্গার শুভ্রধারা।

বহরমপুরে রাজনৈতিক বন্দী রাখার ব্যবস্থা যখন হয়, পূর্বেকার জেল কর্তৃপক্ষও বদল হয়। যে বাঙ্গালী সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন তাঁকে রাঁচী বদলী করা হয় এবং তাঁর স্থলে আসেন ক্যাপ্টেন হেগ্। বর্তমান সিভিল সার্জন বহুপূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে পাথরপ্রতিমা জেলের জেলার ছিলেন। যিনি স্বদেশী কয়েদীদের ভীতি স্বরূপ ও তাঁর ইংরেজ প্রভুদের প্রিয়পাত্র, যাঁকে পেনসন ও খেতাব ভূষিত করে অবসর দেওয়া হয়েছিল। সেই জেলার পুঙ্গবকে পুনরায় কর্মে যোগ দিতে আদেশ করা হয়েছিল, এই

বহরমপুরের জেলে আটক স্বদেশী কয়েদীগণকে শাসনে রাখার জন্য।

প্রথম প্রথম জেলার মশাই কিছু করতে পারতেন না কারণ Mr. Hague সুপারিণ্টেনডেণ্ট খুব এক রোখা লোক ছিলেন। নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন, কারো পরামর্শ নিতেন না। অবশেষে জেলার মহোদয় একটী কাজ করলেন। তিনটি শিষ্য সমেত বাঘা পাঁড়েকে হুগলী জেলে বদলী করাব ব্যবস্থা করলেন। বাঘা পাঁড়ের অপরাধ—সে নিজ হাতে রুটী তৈরী করতো ও ঘি ও ময়দা ইচ্ছামত গুদাম হতে নিত। তার টিকিটে 'দ্বিগুণ রেশন' লেখা ছিল এবং সে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিল।

জেলারবাবুর বাসা জেল গেটেই। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাড়ীর মেয়েরা জেলের ভেতর দেখতেন। জেলারবাবুর একটি ১৩।১৪ বছরের মেয়ে ছিল, বাঘা সেই মেয়েটীকে দেখলেই বলতো "হাম তুমকো সাদি করে গা।" জেলার বাবু কিছু বললে বাঘা হেসে উড়িয়ে দিত, "এ শুশুরার! এত্না গোসা কাহে?" প্রায়ই এ নিয়ে হাসি তামাসা হতো, জেলারবাবু কিছু বললে বাঘা সময়ে সময়ে বলতো "হাম্ তোমকো খাডালে গা।" কাজেই বাঘাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা তো স্বতঃসিদ্ধ। অতএব (বিশেষ করে সেই জন্যই হয়তো বা) বাঘাকে হুগলী জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কিছুই জানি না, হঠাৎ পাগলা ঘন্টি পড়লো। সকলেই ওয়ার্ডের মধ্যে প্রবেশ করলাম। দোতলায় দুটী প্রকাণ্ড হল, মধ্যে প্রাচীর দিয়ে ভাগ করা, প্রথম অংশ হতে দ্বিতীয় অংশে যাওয়া আসার একটী মাত্র দরজা। বাঘা পাঁড়ে দ্বিতীয় অংশে থাকতো।

সুপারিণ্টেনডেণ্ট, জেলার, জেলের ওয়ার্ডাররা ও হুগলী হতে যে আর্মড্ পুলিশ এসেছিল তারা সকলে রাইফেল সমেত জেলের ভেতর প্রবেশ করছেন, এমন কি ওয়ার্ডের ভেতর প্রবেশ করছেন দেখে আমরা গোলযোগের সূত্রপাতই বুঝলাম। সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন "Bagha Pande with three men of his are being transferred to Hoogli Jail."

আমরা সবাই সাহেবকে বললাম "সাহেব! আপনি একটু সময় দিলে আমরা বাঘাকে বুঝিয়ে হুগলী পাঠাতে পারি, না হলে একটা গোলমাল হবার সম্ভাবনা।" জেলার সুপারিণ্টেনডেণ্টকে বললেন "না সাহেব, আপনি ও সব

কথায় ভুলবেন না, এক্ষুণি বদমায়েসদের সরাবার ব্যবস্থা করুন !"

আমাদের মধ্যে অনেকেই সাহেবকে একাজ করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু কার্যে জেলারবাবুর কথাই প্রতিপালিত হলো। সাহেব হুকুম দিলেন, "বাঘাপাণ্ডে ওউর উস্‌কো তিন সাথীকো হুগলী জেল মে—জানেই হোগা।" সশিষ্য বাঘার দল নীরব ছিল, কেউই উঠ্‌তে চাইল না। বাঘার এক শিষ্য ছোটে লাল বলে উঠলো "নেহি যায়গা, কোন লে যায়গা, হামলোক দেখেঙ্গে !"

সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব আর্মড্ পুলিশের হাবিলদারকে হুকুম করলেন "এই, ইস্‌কো পাক্‌ড়ো।" হাবিলদার সামরিক কায়দায় সেলাম দিয়ে বললো "হুজুর এ কাম হামারা নেহি। জেলসে বাহার কর দিজিয়ে, হাম্ ইন্ লোককো হুগলী লে যায়েঙ্গে। জেলকা অন্দর হামারা কুছ্ কাম নেহি—হামকো মাপ কিজিয়ে !"

সাহেব তখন জেলের বড় জমাদারকে ডেকে বললেন "এই, ইস্‌কো পার্ক্‌ড়ো। বাহার লে চলো !" বড জমাদার উত্তর দিল "হুজুর মাফ কিজিয়ে , এ্যাইসা কাম হামারা নেহি হায় ? ই লোককো ওপর জুলুম করনেকো হামারা কোই এক্তিয়ার হায় নেহি।" একে একে সকলেই যখন এই অন্যায় হুকুম তামিল করতে অস্বীকৃত হলো, তখন সাহেব রাগে লাল হয়ে গেলেন, ও দুঃখে, লজ্জায়, রাগে, অভিমানে সাহেব নিজে গিয়েই ছোটে লালের হাত ধরতেই সে অক্লেশে তাহা মুক্ত করলো ও সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। এতে সাহেব "You Brute, you must go, must go"।

ছোটে লাল এই সময়ে একটি লোহার খাটে বসে, একটি পা দিয়ে খাটের একটি পায়া আটকে ধরলো। এই সময় সাহেব রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁপছিলেন এবং হঠাৎ ছোটে লালের সেই খাটের আটকানো পাখানি মচকিয়ে ধরলেন। এতে ছোটেলাল যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে উঠলো। এই চিৎকার ওঠা মাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যেও চঞ্চলতা দেখা দিল এবং মুহূর্ত মধ্যেই প্রহার সুরু হলো।

জেলার মহোদয়কে লাথি মেরে 'তালনাড়ু' পাকিয়ে সিঁড়ির নীচে ফেলা হলো ; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে প্রহারে জর্জরিত করা হলো। তাঁর শুভ্র অঙ্গে রক্তের ধারা বইতে লাগলো, নাকটি ফেটে তাঁর বুক ভেসে গেল। আমি রামসুন্দর সিং (মেদিনীপুর), যামিনীবাবু (ফরিদপুর) এবং আরও অনেকে মিলে

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বাঁচিয়ে বাইরে এনেছিলাম। আমরা তাঁকে বর্মের মত ঘিরে না দাঁড়ালে, সেদিন তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ হারাতেন। তবে সাহেব যত মেরেছেন আমরা সবই সহ্য করেছি আমাদের বুকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ সাহেবকে যতই প্রহার করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তার অধিকাংশই পড়েছে আমাদের পিঠে। প্রহারে জর্জরিত হয়ে আমি রামসুন্দরদা, যামিনীবাবু যখন সাহেবকে জেলের গেটে নিয়ে গেলাম তখন আমাদের আর দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। গেটে পৌঁছে দেখি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গেটে অবস্থান করছেন, জেলের বাইরের প্রাঙ্গণটি সৈন্য ও উৎসুক জনতায় পরিপূর্ণ।

পুলিশ সাহেব সিভিল সার্জনের দেহে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে দেখে হাবিলদারকে হুকুম দিলেন "কুইক মার্চ! এই জমাদার! জেল গেট খোল্ দেও।" আমরা তিনজনে জেল গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, জেলের জমাদার আমাদের গেটের চাবি ছেড়ে দিয়ে, দূরে দাঁড়াতে বললো। আমরা জানালাম "আমাদের খুন না করলে আমরা গেট ছাড়বো না।" পুলিশ সাহেব রাগে পাগলের মত এসে আমাদের সরে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন আমরা কিছুতেই গেট খুলতে দেবো না তখন হুকুম দিলেন "এ লোককো জোরসে হঠা দো।" ঠিক এই সময়ে সিভিল সার্জন এসে বললেন—"এঁদের ওপর যেন কোন অন্যায় না করা হয়, কারণ আজ এঁরাই আমার জীবন রক্ষা করেছেন।" তখন আমাদিকে অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, Mr. Adu বহু প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন "যো লোক কসুর কিয়া ঐ লোককো মাঙ্গতা হ্যায়।" আমরা সকলেই বললাম "তাই হবে, আপনাকে আগামীকাল এসে বিচার করতে হবে, আজ আর কিছু হবে না।"

পুলিশ সাহেব রাগান্বিত ভাবে আমাদিকে অনেক কথাই শোনালেন। কিন্তু "আমাদের বলবার কোন কথা নেই," মাত্র এই কথাই জানালাম "তবে ডাক্তার সাহেবেরও দোষ আছে।" যাই হোক, সেদিনের গোলযোগ মিটলো; আমরা ভেতরে গেলাম। Mr Adu পরদিন সকাল আটটায় জেলের অশ্বত্থতলায় আমাদিকে ডাক দিলেন। আমাদের সকলে Mr Adu সাহেবের মত ব্যক্ত করা হলো। এমনি আন্দোলনের মাদকতা যে মুহূর্তের মধ্যেই মানুষকে মহৎ মানুষ করে তোলে। যেমন জানানো হলো যে "গতকাল ডাক্তার সাহেব ও জেলার সাহেবকে যাঁরা মেরেছেন, তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে নিজ নিজ দোষ স্বীকার

করে Mr Adu সাহেবের সামনে উপস্থিত হোন", অমনি স্বেচ্ছাসেবকগণ একে একে দোষ স্বীকার করে সারবন্দী ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই সত্যবাদিতা ও সাহসিকতা দেখে Mr Adu বড় মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন "আচ্ছা আমি খুসী হয়েছি, তবে এখন এঁদের বিচার কি হবে ?"

উত্তরে আমরা জানালাম "ইচ্ছা করলে আপনি নিজে এঁদের শাস্তি দিতে পারেন, কিম্বা যদি আমাদের ওপর ভার দেন তো আমরাও বিচার করতে পারি। আপনার যা অভিরুচি তাই করুন।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সাহেব বললেন, "যদি আপনাদের ওপর বিচারের ভার দিই তবে আপনারা কি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন ?" আমরা যুক্তি করে বললাম "সমস্ত স্বদেশী কয়েদী মিলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সকলে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করবো ও সেলে বন্ধ থাকবো।" Mr Adu বললেন "বাহাত্তর ঘণ্টা পুরাপুরি উপবাস করবেন ?" আমরা উত্তর দিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাই মঞ্জুর করে জেল ত্যাগ করলেন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হলো। আমাদের ওয়ার্ডে জলের ট্যাঙ্কে জল দিয়ে যাওয়া হতো, সেই জলই ওয়ার্ডের ভিতর একমাত্র পানীয় জল। সেইদিন হতে ওয়ার্ডের ট্যাঙ্কে জল দেওয়া বন্ধ হলো। দিনরাত্রি জলের জন্য কষ্ট হলো, যে-সব ছোট ছোট ছেলেরা ছিল, জলের জন্য ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো কিন্তু উপায় কি ? পরদিন বেলা দশটার সময় Mr. Adu জেল দেখতে এলেন, তখন তাঁকে জলের কথা জানানো হলো। তিনি বললেন "কই আমি তো জল বন্ধের কথা বলি নি বা আদেশ দেই নি। আচ্ছা কাল হতে জল দেওয়া হবে।" জল খেয়ে বাকী দুদিন কাটানো গেল, চতুর্থ দিনে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

এই ঘটনা নিয়ে শহরে বড়ই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ সুখে-দুঃখে জেলের দিনগুলি কাটতে লাগলো। তবে সেই হতে জেলের মধ্যে আমাদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এরপর বাঘা পাঁড়েকে শিষ্য সমেত অনেক বুঝিয়ে হুগলীতে পাঠানো হয়েছিল। এরপর আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নি। সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব আমাদের তিনজনকে, রামসুন্দর সিং, বামনদাসবাবুও আমাকে ভালবাসতেন, সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন। জেল বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে লাগলো।

আরও কয়েকমাস এই রকমে কাটতে লাগলো, লেখাপড়া ও সূতা কাটাও চলতো। আরও কিছুদিন পর আমার মুক্তির দিন নিকটবর্তী হতে লাগলো। আমার মনের মধ্যে (এখানকার এই সব সঙ্গীদের জন্য) বিয়োগ ব্যথা জেগে উঠলো, প্রায়ই এজন্য মনে মনে কষ্ট পেতাম। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে বের হতে না পারার দুঃখে আমার অন্তর হাহাকার করে উঠতো। প্রায়ই মনে হতো এই দেবহৃদয় মানুষগুলিকে জেলে রেখে আমি যাবো না। কিন্তু দিন ঠিক নিয়মিতভাবে সূর্য ওঠা ও অস্তের সঙ্গে কাটতে লাগলো। আমার মুক্তির দিন কাছে এসে পড়লো। যথাসময়ে আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্য সকালবেলায় সভা করলেন জেলের মধ্যে। ফরিদপুরের যামিনীবাবু ও ফরিদপুরের কর্মীগণ স্বহস্তে কাটা সূতোয় খদ্দর তৈরী করিয়েছিলেন, আমার স্ত্রীর জন্য একটি সাড়ী ও একটি ধুতি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই অমূল্য উপহার হাতে নিয়ে সজল নয়নেই জেল হতে বেরুলাম।

সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেব বেলা সাড়ে দশটা অবধি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। দেখা না হওয়ায় দুঃখিত ভাবে চলে গিয়েছিলেন, আমিও গেটে এসে তাঁর দেখা না পেয়ে আন্তরিক ব্যথিত ও দুঃখিত হয়েছিলাম।

জেল হতে বেরিয়ে প্রথমে যাই বহরমপুর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী মশাইয়ের বাসায় এবং সেখান হতে বহরমপুরের প্রবীণ উকিল অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে তার বাড়ীতে যাই। তার বাড়ীতে খাওয়া সেরে মাতৃদেবীর চরণ দর্শনের জন্য আমার গ্রামের বাড়ীতে যাই। সেখানে দু-পাঁচদিন থেকে কলকাতা ফিরে আসি, শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু দাস মশাইয়ের চরণদর্শন-মানসে (তখন তিনি ও অনেকে আগেই মুক্তি পেয়েছিলেন)। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম, কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমায় বললেন "সোমেশ্বর! তুমি বর্দ্ধমান জেলা হতে ইলেক্‌সনে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে এবং আমাদের পূর্ণ সমর্থনই তুমি পাবে।" সবিনয়ে তাঁকে জানালাম "এখনও যোগ্যতা অর্জন করতে পারি নি, তা ছাড়া আমার মায়ের ইচ্ছা আগে ডাক্তারী পাশ করে তারপর যা ইচ্ছা পথ বেছে নেওয়া।"

আমার কথা শুনে তিনি মৃদু-মধুর হাসতে লাগলেন।

ডাঃ সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী

৺রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মশাই বর্ধমান জেলার মণ্ডল গ্রামের সন্তান। ১৮৭৮ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে ডাক্তারী পাশ করেন। ৺ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, স্যার নীলরতন সরকার মশাই ইত্যাদি তাঁর বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তিনি ত্রিচিনপল্লী (মাদ্রাজের) অঞ্চলে গবর্নমেন্টের চাকরী নেন। কিছুদিন পরে যাতায়াতের অসুবিধা হেতু তিনি মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর হাঁসপাতালে চলে আসেন। তারপরে মেঁও হাঁসপাতালে সিভিল সার্জন পদে বেশ কিছুদিন থাকেন। তৎকালে মেমারীতে ভীষণ ম্যালেরিয়া, দেশের লোকের দুরবস্থা দেখে তিনি মেমারীতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস ও ডাক্তারী আরম্ভ করেন।

পুত্রসন্তান তাঁর একটিও বাঁচে নি, মাত্র দুই কন্যা। তিনি পুত্রার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং মেমারীর বিখ্যাত 'সোমেশ্বরনাথ' শিবের প্রসাদে (তাঁর স্ত্রীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান) সোমেশ্বরপ্রসাদের জন্ম হয়, সন ১৩০৩ সালে ২৪শে পৌষ। 'মরাহাজা ছেলে' বলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সোমেশ্বর বিশেষ আদরের ছিলেন।

সন ১৩১২ সালে ১৩ই কার্তিক রাধাগোবিন্দবাবু (একবছর কালজ্বরে শয্যাগত থাকার পর) পরলোকগমন করেন। রাধাগোবিন্দবাবুর পত্নী রামবালা দেবী মেমারীর বাড়ী ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় মশাইকে ভাড়া দিয়ে পুত্র-কন্যা সহ নিজপল্লী ভবনে বাস করতে আরম্ভ করেন। গ্রাম্য স্কুলে পড়াশুনার অসুবিধে হওয়ায় ১৩১৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে আত্মীয় দুর্গাদাসবাবু সোমেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাওড়া বেলিলিয়াস স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং নিজগৃহে পুত্রবৎ পালন করেন। সন ১৩১৮ সালে ফাল্গুনেই সোমেশ্বরের সঙ্গে দুর্গাদাসবাবুর কন্যার বিবাহ হয়।

সোমেশ্বর ১৩২৪ সালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৩২৭ সালে ফার্ষ্ট এম-বি পরীক্ষার পর বিলেত যাবার জন্য প্রস্তুত হন। ঐ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মশাইয়ের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে রাজসাহী, নদীয়া, পাবনা, মুর্শিদাবাদ জেলার নীলকর এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন করেন। কৃষক আন্দোলন তখন কংগ্রেস সমর্থন লাভ করে নি।

দেশবন্ধুর সহযোগীতায় এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করেন ও দীর্ঘদিন রাজসাহী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, আলিপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। আলিপুর জেলে থাকাকালীন মহান্ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হন।

জেলের বাইরে এসেই মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর প্রচার আন্দোলনে যোগ দেন এবং মেমারীর (নিজের জন্মস্থান) বাড়ী ও সমুদায় সম্পত্তি (তৎকালীন যার মূল্য ছিল লক্ষাধিক টাকা) রসিকলাল বিষয়ীর নিকট সামান্য দশহাজার টাকায় বন্ধক দেন এবং খদ্দর ও চরকা প্রচার আরম্ভ করেন। কুসুমগ্রামে থেকেই প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। জেল হতে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই ফিরেছিলেন, সে কারণ পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। দুর্গাদাসবাবু তাঁকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য পুনঃ কলকাতা আনেন।

জননী ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাইয়ের ইচ্ছায় ও অনুরোধে পুনরায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমানে আর. জি. কর) ভর্তি হন। ঐ সময় নলীন সরকার ষ্ট্রীটে—শ্যামবাজারে মেডিকেল হোস্টেলেই থাকেন। ঐ সময় একদিন মেমারীর রসিকলাল বিষয়ীর পুত্র বিষ্টু বিষয়ী ঐ হোষ্টেলে কাতর ও মুহ্যমান অবস্থায় সোমেশ্বরের নিকট এসে বলেন, "ভাই সর্বনাশ হয়েছে, তোমার বন্ধকী তমসুক ও হ্যাণ্ডনোটখানা তিনমাস আগে তামাদী হয়ে গেছে, বাড়ীতে এ নিয়ে মহা ভাবনা ও হুলস্থুল হচ্ছে।

সোমেশ্বর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়েন, উত্তর দেন "আমি বেঁচে থাকতে হ্যাণ্ডনোট তামাদি হবে কি করে? হ্যাণ্ডনোট কই? আমি তিনমাস আগের তারিখ দিয়ে উসুল দিয়ে দিচ্ছি।" বিষ্টুবাবু বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন "তুমি উসুল দেবে? আমি তো হ্যাণ্ডনোট সঙ্গে আনি নি, মেমারী গিয়ে সই দিতে হবে।"

মেমারীতে যখন সই দিতে আসেন তখন স্থানীয় বহু ব্যবসাদার ও পরিচিত শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই বলেছিলেন যে "আগে কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করুক, তারপর সই দেওয়া হবে, সই দিলে আর কিস্তিবন্দী করবে না ওরা।" সোমেশ্বর উত্তর দেন—"আমি যে সই দেব বলেছি, কথার খেলাপ করতে পারি না।" সত্য ও ন্যায়ের সম্মান তিনি আজীবন সমান ভাবে রেখে গিয়েছেন। গোপন দান তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট। ঐ মেডিকেল কলেজে সহপাঠিদেরও তিনি দু-তিন জনকে গোপনে সাহায্য করতেন, (তাঁদের মুখেই পরে শুনেছি) অন্যের শ্রুতিগোচর হলে তাঁদের সম্মানহানির আশঙ্কায় তিনি অতি সন্তর্পণে এই কাজ করতেন।

ডাক্তারী আরম্ভ করেও তিনি দুঃস্থ রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাও

করতেন। তাঁর কম্পাউণ্ডার মধ্যে মধ্যে রাগ করলে বলতেন "ওরা আগেই দিয়ে রেখেছে আমাকে।"

দেশ প্রেম, পরোপকারীতা, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। কলকাতায় ১১০ নং বেনিয়াটোলায় তিনি অনেকদিন ছিলেন। তাঁর ডাক্তারখানাও নিকটে ছিল। বহু খ্যাতনামা মনিষীবৃন্দের পদধুলি বাসভবন ও ডাক্তারখানায় পড়ত।

তিনি একবার কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদ প্রার্থী হয়ে স্যার হরিশঙ্কর পালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। স্যার হরিশঙ্কর পালের অনুরোধক্রমে বহু আত্মীয় বন্ধুর অনুরোধেও তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করাতে পারা যায় নি। বি. পি. সিংহ রায়, টি, ডি. কুমার, চরণ দলের বহু সদস্যবৃন্দ প্রভৃতিকেই তাঁকে স্বমতে আনতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবুর একান্ত অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

তাঁর সংস্রবে একবার এলেই অল্পদিনের মধ্যেই মুগ্ধ হতে হতো। বেনিয়াটোলার তরুণ বালকের দল ছিল তাঁর অতি প্রিয়, সোমেশ্বরও ছিলেন তাদের প্রিয়-বন্ধু ও সহচর। দু-এক দিন তাঁকে না দেখলে তারাও ব্যাকুল হয়ে উঠত।

অনেকগুলো ক্লাব ও সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। অসহায় ছাত্রকল্যাণ সঙ্ঘের তিনি সভাপতি ও পরিচালক ছিলেন। বহু দুঃস্থ ছাত্রের তিনি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তৎকালীন প্রত্যেক কলেজেই দুটি করে আসন অসহায় ছাত্রকল্যাণ সঙ্ঘের জন্য রাখা হতো বিনা বেতনে।

শক্তি সংঙ্ঘ তাঁর নিজ হাতে গড়া।

নদীয়া জেলায় সর্বজন পরিচিত জনকল্যাণ সংঙ্ঘ ও শঙ্কর মিশন তাঁরই সৃষ্টি। নিখিল বঙ্গ মৎসজীবি সংঙ্ঘের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। অসহায় ছাত্রকল্যাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বহু অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের স্কুল ও কলেজে পড়ার সুবিধা করে দেন। প্রয়োজনবোধে বহু ছাত্রের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভারও বহন করেছিলেন।

নদীয়ার নিভৃত পল্লী অঞ্চলে শিবপুর গ্রামে (যে শিবপুর ডাকাতীর কথা বহু লোকেই জানেন) স্কুল প্রতিষ্ঠাকালীন সামর্থের অতিরিক্ত অর্থও ব্যয় করে গিয়েছেন। পলাশীপাড়া ও মুর্শিদাবাদের সর্বাঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্যও তাঁর সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ তিনি ব্যয় করে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীজির লবণ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়েছেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে থাকেন। দণ্ড ভোগের পর মুক্তি লাভ করে পি/৮৮, বি. কে. এভিনিউতে আসেন। এখানেই তিনি ১৯৪৯ সালের ২৩শে নভেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী, দুই পুত্র নারায়ণ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ, চারটি বিবাহিতা কন্যা ও তিনটি নাবালিকা কন্যা রেখে যান।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী

চির-তরুণ সোমেশ্বরদা

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। সোমেশ্বরদার সঙ্গে অবিভক্ত নদীয়ার একটি পল্লীতে আমার সেই প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সোমেশ্বর চৌধুরীর দেহে মনে উদ্বেল যৌবনের তখন পরিপূর্ণতা। বেশ গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। সুন্দর একজোড়া গোঁপ। বিরাট এক জনসভায় সোমেশ্বরদা বক্তৃতা করতে উঠলেন। বক্তৃতায় বারুদের গন্ধ জোরালো। লাগ-সই উপমাগুলি মন্ত্রমুগ্ধ জনতার কাছে ছিলো অতীব প্রাণস্পর্শী। হাজার হাজার মানুষের রক্তে আগুন জ্বালাতে হলে যে ভাষা জানা দরকার সেই ভাষায় সোমেশ্বরদার অধিকার ছিলো সমস্ত বাদানুবাদের ঊর্ধে।

নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে রাজসাহীর এবং নদীয়ার পল্লী অঞ্চলের কৃষকেরা তখন ওষ্ঠাগতপ্রাণ। তারা দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা জানালে সোমেশ্বরদা প্রেরিত হলেন নদীয়ার শিকারপুর অঞ্চলে চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্য। দেশবন্ধু পাকা জহরী ছিলেন। একনজরেই হীরের টুকুরো সোমেশ্বরকে তিনি চিনে নিলেন। সুভাষচন্দ্রকেও চিনে নিতে তার একমুহূর্ত বিলম্ব হয় নি। প্রথম শ্রেণীর নেতারা যেন পাকা রেস খেলোয়াড়। কোন্ ঘোড়া রেসে জিতবে একনজরেই তা বুঝতে পারেন।

সোমেশ্বরদা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। দুর্গত নিপীড়িত প্রজাদের দলিত মথিত জীবনের করুণকাহিনী যত শুনতে লাগলেন অন্তরের বিষাদসিন্ধু ততই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো। কি করে অত্যাচারকে নির্মূল করা যায় এই চিন্তা সোমেশ্বরদার হৃদয়াকাশে দিনরাত্র জ্বলতে লাগলো ধ্রুবতারার মত। সোমেশ্বরদার দিবানিশি ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান। নববিবাহিত বধূর কথা বারে বারে মনে পড়ে। বাসরঘরের মধুযামিনীর স্মৃতির সৌরভে হৃদয় তখনও পূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু বৃহত্তর জগতের লাখো লাখো আর্তমানবের মাঝে চৈতন্যের মহাবিকীরণের মধ্যে এমন একটি গভীর অনির্বচনীয় আনন্দ আছে যার আস্বাদনে প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের তীব্রতম বেদনাকেও ভোলা যায়। জীবনের সব কাঁটা তখন গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে।

অপযাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে অনুভব ক'রে সোমেশ্বরদার তখন জন্মান্তরের পালা! সোমেশ্বরদার যৌবনের তরঙ্গশীর্ষে সেই আলো ঝলোমল দিনগুলির সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেছে তারা নিঃসংশয়ে জানে, কোন্ দিব্যস্বরে বিধাতা তাঁর জীবন-বীণা বেঁধেছিলেন। সোমেশ্বরদা বাইরে গৃহী হোলেও অন্তরে তাঁর বাজতো বৈরাগীর একতারা। মুক্তপথের বাঁশির সুরে রক্ত তাঁর চিরদিনই দুলে দুলে উঠেছে। তাঁর গৃহদ্বার ছিলো সহকর্মীদের কাছে সর্বদা উন্মুক্ত। ক্ষুধার অন্ন সকলের সঙ্গে কেমন করে ভাগ করে খেতে হয়—তা সোমেশ্বরদা খুব ভালো করেই জানতেন!

নীলবিদ্রোহের সারথি সোমেশ্বরদার সঙ্গে একদা নদীয়ার পল্লীতে পল্লীতে পদ্মার তীরে তীরে আমার যৌবন কেটেছে। দেখেছি—কেমন করে তাঁর জোরালো কণ্ঠের আগ্নেয় বক্তৃতাগুলি নিপীড়িত মানুষগুলির অবসন্নচিত্তে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করেছে, বৈপ্লবিক চেতনায় তাদের হতাশ চিত্তকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। সোমেশ্বরদা লোকশক্তিকে আশ্রয় করে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের লালমুখগুলি কেমন করে মাটিতে খসে দিয়েছে—সে দৃশ্যও আমি দেখেছি। দর্শনায় বেরু কম্পানির বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে সোমেশ্বরদার মধ্যে দেখেছি মানুষের প্রতি কী অসীম দরদ! অত্যাচারের প্রতি কী দারুণ ঘৃণা!

সোমেশ্বরদা ছিলেন সব্যসাচী। ভাঙ্‌তেও যেমন ওস্তাদ, গড়তেও তেমনি ওস্তাদ। দুই হাত সমান চলতো। জীবনের অপরাহ্ণে তাঁকে দেখেছি গ্রামে গ্রামে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফিরতে, যাতে পল্লীঅঞ্চলে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হতে পারে। নদীয়া তাঁর দান কোনদিনই শোধ করতে পারবে না। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল কী সুগভীর!

কিন্তু সোমেশ্বরদার সঙ্গে কৃষ্ণনগর জেলে একত্র বাসের সেই অপূর্ব স্মৃতি! সোমেশ্বরদার বয়স হলেও বয়সের ছাপ তাঁর কোথাও ছিল না। তিনি ছিলেন চিরতরুণ। জেলখানায় সোমেশ্বরদাকে না হলে ছেলেদের তাস খেলা জমতো না। তাঁকে ছলে বলে কৌশলে হারিয়ে দিয়ে রাগাতে পারলে তাদের হাসির উচ্ছ্বাসে ঘর মুখর হয়ে উঠতো।

আসল সোমেশ্বরদার নির্ভেজাল প্রেমিক রূপটি কিন্তু ধরা পড়তো যেদিন বৌদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সকাল থেকেই সোমেশ্বরদা সুরু করতেন পুষ্পচয়ন। আমরা হাসাহাসি করতাম, পুষ্পচয়ন তো প্রিয়তমার আসন্ন আবির্ভাবেরই ইঙ্গিত। এরপর মালা গাঁথার পালা। সোমেশ্বরদা নিঃশব্দে মালা গেঁথে চলেছেন আহার নিদ্রা ভুলে। যথাসময়ে বৌদির আগমনের সংবাদ এলো। সোমেশ্বরদা যত্নে গাঁথা মালাটি হাতে করে চললেন বৌদি যেখানে অপেক্ষা করছেন। পিছনে যত তরুণের দল সেই অপরূপ দৃশ্যটি দেখবার জন্য যে দৃশ্য ছিল শুধু স্বর্গের দেবতাদেরই দেখার যোগ্য। যথাসময়ে যথাস্থানে মালাটি অর্পিত হলো। বাইরে উঠলো হাসির হুল্লোড়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের সুষমাকে চির শ্যামল, চির অম্লান রাখবার জন্য কেমন করে প্রেমের সাধনা করতে হয় তাও তাঁর কাছ থেকে শিখেছি আমরা।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়